দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য

শহীদ আবদুল কাদির আওদাহ

দ্বীন-ইসলামের বৈশিষ্ট্য

শহীদ আবদুল কাদের আওদাহ
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১

৪র্থ প্রকাশ

মহররম	১৪২৩
চৈত্র	১৪০৮
মার্চ	২০০২

বিনিময় ঃ ২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه -এর বাংলা অনুবাদ

DEEN ISLAMER BAISHISHT by Shahid Abdul Kadir Awdah. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 20.00 Only.

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীতে মানবতার পক্ষে প্রকৃত কল্যাণের উৎস আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও শেষ নবীর অনুসরণ-নীতির ভিত্তিতে রচিত জীবন ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণের মধ্যেই যে বিশ্ব-মানবের মুক্তি নিহিত, মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা আইনবিদ মিশরের 'শহীদ আবদুল কাদের আওদাহ' এ সত্যটিই বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তার 'আল-ইসলামু বায়না জেহ্‌লে আবনায়েহী ওয়া ইজ্‌যে ওলামায়েহী' নামক গ্রন্থখানিতে। গ্রন্থখানির অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানিতে কোন প্রকার ভুল পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানালে তা সংশোধনে সচেষ্ট হবো।

প্রকাশক

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইসলামের বিধান	৭
ইসলামী বিধানের বিশেষত্ব	৮
শরীয়াতের বিধান অখণ্ড	১৪
ইসলামী শরীয়াত আল্লাহ প্রদত্ত ও বিশ্বব্যাপক	১৯
ইসলামী শরীয়াত পূর্ণাংগ ও শাশ্বত	১৯
শরীয়াত ও মানব রচিত আইনের প্রকৃতিগত পার্থক্য	২২
শরীয়াত ও মানব রচিত আইনের মৌলিক পার্থক্য	২২
শরীয়াতের আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি	২৮
আইন প্রণয়নে উলীল-আমর-এর অধিকার	২৯
উলীল আমর-এর সীমা লংঘন পরিস্থিতি	২৯
দেশ শাসকদের ভূমিকা	৩১
ইসলামী দেশে ইউরোপীয় আইন প্রবর্তনের কারণ	৩১
শরীয়াতের ওপর আইনের প্রভাব	৩৩
মানবীয় আইন ও শরীয়াতের মাঝে বিরোধ	৩৫
শরীয়াত বিরোধী আইন কিভাবে কার্যকারিতা হারায়	৩৬
ইসলামের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক নেই	৪৮
শরীয়াত একালে অচল	৫৮
শরীয়াতের কোন কোন বিধান সেকালের জন্যে নির্দিষ্ট	৬৮
কোন কোন আইন অপ্রয়োগযোগ্য	৬৯
ইসলামী ফিকাহ্, ফিকাহবিদদের রায়	৭০
ইসলামী সংস্কৃতির ধারক এক শ্রেণীর লোক	৭৭
আমাদের দূরবস্থার জন্যে দায়ী কে?	৮১
মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের দায়িত্ব	৮৩
রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব	৮৪
আলেম সমাজের দায়িত্ব	৮৭

www.bjilibrary.com

অনুবাদকের কথা

মিশরের শহীদ আবদুল কাদের আওদাহ্ লিখিত الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه নামক গ্রন্থখানির স্বচ্ছন্দ ও ভাবানুবাদ পেশ করার সৌভাগ্য মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে দিয়েছেন। সেজন্যে আমি তার অশেষ শোকর আদায় করছি।

বইখানি আকারে ছোট হ'লেও প্রকারে, বিষয়বস্তুতে ও উপস্থাপনের বলিষ্ঠতায় অনন্য ও বিরাট। এ ব্যাপারে পাঠক মাত্রই আমার সাথে একমত হবেন বলে আশা রাখি।

বইখানিতে বিশেষভাবে ইসলামের আইনগত দিকের উল্লেখ করা হয়েছে এবং মানব রচিত আইনের সাথে ইসলামী আইনের তুলনা করে শেষোক্তটির শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা প্রমাণ করা হয়েছে। এ বইয়ের মূল লেখক যে এরূপ একটি রচনা উপস্থাপনের পূর্ণ যোগ্যতা ও জ্ঞানের গভীরতার অধিকারী ছিলেন, তা বলে বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না। পাঠকবর্গকে তাঁর সাথে পরিচয় করার উদ্দেশ্যে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত করেছি।

মূল বইখানিতে মিশরে আইন রচনা সংক্রান্ত কিছু খুটিনাটি কথা ছিল, বাংলা পাঠকদের নিকট তা অবান্তর বিবেচিত হবে মনে করে সে অংশ বাদ দেয়া হয়েছে।

অনুবাদের সফলতা পাঠকদেরই বিচার্য।

অনুবাদক

www.bjilibrary.com

গ্রন্থকার পরিচিতি

'দ্বীন-ইসলামের বৈশিষ্ট্য' নামক এ বইখানির মূল লেখক শহীদ আবদুল কাদের আওদাহ্। তিনি মিশরের অধিবাসী ছিলেন। গ্রন্থখানি মূলত আরবী ভাষায় লিখিত।

আবদুল কাদের আওদাহ্ শহীদের নাম এ দেশে সাধারণ ভাবে সুপরিচিত নয়। কিন্তু তার রচিত এ ছোট্ট বইখানি পাঠ করলেই বুঝতে পারা যায়, তিনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞানে সুপণ্ডিত, সেই সংগে আধুনিক আইনে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও গভীর পাণ্ডিত্য মণ্ডিত। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের বীর সৈনিক। তার সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

আবদুল কাদের আওদাহ্ শহীদের বাল্যকালীন অবস্থা সম্পর্কে শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পরই আইন শিক্ষার জন্যে আইন কলেজে ভর্তি হন। তার এ যৌবন বয়সেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার ও উন্নত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। ১৯৩০ সনে আইনের সর্বশেষ পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। অতপর তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত হন। এ সময়ও তিনি তাঁর দ্বীনদার ও বিবেকের স্বাধীনতাকে এক বিন্দু ক্ষুণ্ন হতে দেননি। এ সময়ের একটি ঘটনা থেকে তাঁর এ বিবেক-বুদ্ধির স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে।

তিনি যখন সুয়েজ খালের পূর্বাঞ্চলে কলেজের নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শক ছিলেন, তখন মিসরীয় দ্বীনী রাজনৈতিক দল 'আল-ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ ইসমাইলিয়া কেন্দ্র থেকে মিশরের পার্লামেন্টের সদস্য পদে নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন সরকার সাম্রাজ্যবাদী ও ইসলামের দুশমন ইংরেজদের উস্কানীতে পড়ে শহীদ হাসানুল বান্নাকে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্যে নানাবিধ অমানুষিক ও কুটিল ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে সরকার

www.bjilibrary.com

সর্বপ্রকার ভীতি প্রদান, ধোঁকা, প্রতারণা, জোর জবরদস্তি ও নির্যাতন নিস্পেষণের হাতিয়ার ব্যবহার করতেও এক বিন্দু কুণ্ঠিত হচ্ছিল না। ন্যায় নীতি ও সুবিচারের আদর্শ পরিপন্থী এ নির্লজ্জ সরকারী আচরণ দেখে আওদাহ্ শহীদ অত্যন্ত মর্মাহত হন। এবং তার প্রতিরোধের বাস্তব পন্থা গ্রহণ না করে স্থির নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি নিজেই ইসমাইলিয়া উপস্থিত হয়ে একটি বিরাট জনসভার ব্যবস্থা করলেন এবং তাতে প্রদত্ত এক দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ভাষণে সরকারের এ অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তিনি জনগণকে সরকারের এ হীন আচরণকে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করলেন। জনগণকে তিনি এই আশ্বাসও দিলেন যে, এর ফলে জনগণের উপর সরকার কর্তৃক কোনরূপ নির্যাতন চালানো হলে নির্বাচন কমিশনের একজন পদাধিকারী ব্যক্তি হিসেবে তিনি তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।

এ ঘটনার পর এক সময় তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। বিচারপতি থাকা কালে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের ঝাণ্ডা উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বিচার হত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও ন্যায় ভিত্তিক। কারও ওপর একবিন্দু যুলুম করতে তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি বিচারক; কিন্তু সর্বোপরি আমি একজন মুসলমান।'

'আল–ইখওয়ানুল মুসলেমুন' দলে তাঁর যোগদানের কাহিনী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। ১৯৫০ সনে বাদশাহ ফারুক এ দলটিকে বেআইনী ঘোষণা করে তার সমস্ত বিষয়–সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। ইখওয়ান এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ঘটনাক্রমে শহীদ আওদাহই তখন আদালতের বিচারক ছিলেন। তিনি মামলার পূর্ণাংগ শুনানী গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত ইখওয়ানের পক্ষে রায় দেন। তিনি ইখওয়ানের সহিত আগে হতেই পরিচিত ছিলেন ; কিন্তু দলের বিপ্লবী দাওয়াত, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, একান্তভাবে আল্লাহতে আত্মসমর্পনের ভাবধারা ও বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থার সহিত ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলেন মামলায় শুনানী কালে এই প্রথমবার। সরকার পক্ষ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল করলে তিনি জজ পদে ইস্তেফা দিয়ে ইখওয়ানের পক্ষে ওকালতী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সময়ই তিনি 'আল–ইখওয়ানুল মুসলেমুন' দলের সম্মানিত সদস্য পদে বরিত হন।

www.bjilibrary.com

১৯৫১ সনে ইখ্ওয়ানের প্রধান নেতা—মুরশিদে আম—শায়খ হাসানুল হুজাইবী মরহুম তাকে ইসলামী আন্দোলনের মূল সংগঠনের কাজে পুরাপুরি আত্মোনিয়োগ করার পরামর্শ দেন। এই সময়ই তাকে ইখ্ওয়ানের ডেপুটি মুরশিদে আম নির্বাচিত করা হয়। নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্যে তিনি প্রাইভেটভাবে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীর উকীল হিসেবে গণ্য হলেন। চাকুরী করা কালে তিনি আধুনিক আইনের সংগে সংগে ইসলামী আইন ও ফিকাহর গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। ফলে উভয় ধরনের আইনে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও বিচক্ষণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আইন ব্যবসায় শুরু করে আইন সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়নের কাজও শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৯ সনে তিনি আইনের তুলনামূলক অধ্যয়নের ফলশ্রুতি স্বরূপ التشريع الجنائى الاسلامى 'ইসলামী ফৌজদারী আইন' নামে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন ও এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থখানি সমগ্র আরব জাহানে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে এবং ১৯৫১ সনে ফুয়াদ আল-আউয়াল এ গ্রন্থখানিকে আইন-পুরস্কার দেয়ার জন্যে মনোনীত করেন। এ পুরস্কারের মূল্য ছিল এক হাজার মিশরীয় গিনি (প্রায় পনের হাজার টাকা)। মিশর সম্রাট এ পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এ গ্রন্থের দরুন আন্তর্জাতিকভাবে মিশরের সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জিত হোক। কিন্তু এ গ্রন্থে লিখিত দুইটি বাক্যের ওপর তার ঘোরতর আপত্তি ছিল এবং তা বাদ দেয়ার জন্যে তিনি উপর্যুপরি চাপ দিতে থাকলেন। সে দুইটি বাক্যের মর্মছিল ; ইসলামে রাজতন্ত্র ও বংশানুক্রমিক বাদশাহীর কোন স্থান বা অবকাশ নেই এবং কোন শাসক প্রশাসকই আইনের উর্ধে নহেন। বরং ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে শাসক ও শাসিত তথা সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণভাবে সমান মর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন। স্মর্তব্য যে, এ সময় মিশরে ফারুকের প্রচণ্ড দাপটের বাদশাহী বিরাজমান ছিল। তাই অনুরূপ চিন্তা-বিশ্বাসের লোক সরকারীভাবে পুরস্কার পাওয়া দূরের কথা, প্রাণের নিরাপত্তা লাভই ছিল অচিন্তনীয়। কিন্তু আবদুল কাদের আওদাহ্ শহীদ এ বাক্যদ্বয় প্রত্যাহার করতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করলেন। তিনি কেবল যে ধন-সম্পদ, খ্যাতি ও রাজকীয় সম্মান-মর্যাদার প্রতি পদাঘাত করলেন তা-ই নয়, বাদশাহের দরবারে তিনি 'ভয়ানক ব্যক্তি' রূপে চিহ্নিতও হলেন। অথচ এ

www.bjilibrary.com

সময় জামে আল-আজহারের প্রখ্যাত আলেম ও শিক্ষাবিদগণ বাদশাহ ফারুকের নামে খোত্‌বা পাঠ করতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং প্রশাসকবৃন্দ তার মুকুট ও সিংহাসন রক্ষার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

১৯৫২ সনের জুলাই মাসে মিশরে সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সামরিক বাহিনী জেনারেল নজীবের নেতৃত্বে বাদশাহ ফারুকের উৎখাত ও নির্বাসিত করে এবং সমস্ত শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়। এ বিপ্লবে ইখ্‌ওয়ানুল মুসলেমুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতপর সামরিক কমাণ্ড যতদিন জেনারেল নজীবের হাতে ছিল ততদিন ইখ্‌ওয়ান ও বিপ্লবী বাহিনীর পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। জেনারেল নজীব শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে যে কমিশন নিয়োগ করেছিলেন, তাতে আবদুল কাদের আওদাহ শহীদও একজন সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি মিশরের শাসনতন্ত্র পুরাপুরি ইসলামী ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে রচনা করার সুপারিশসমূহও পেশ করেছিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই এক আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফলে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। জেনারেল নজীব সামরিক কমাণ্ড থেকে বহিষ্কৃত ও বন্দী হন এবং ইখ্‌ওয়ানের 'মুরশিদে আম' আল-হুজাইবী ও ডেপুটী 'মুরশিদে আম' আওদাহ শহীদসহ আরও চারজন প্রখ্যাত ইখ্‌ওয়ান নেতার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়। এ চারজন নেতা হলেনঃ শায়খ ফরগালী, ইউসুফ তলয়াত, ইবরাহীম তাইয়্যেব ও হিন্দাভী দুয়াইর। এটা ১৯৫৪ সনের ৭ই ডিসেম্বরের ঘটনা। পরে আল-হুজাইবীর মৃত্যুদণ্ড জাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু অন্যান্যদের মৃত্যুদণ্ড ৮ই ডিসেম্বরে কার্যকর করা হয়। এ ব্যাপারটি যে নিতান্তই অমানুষিক যুলুম ছিল এবং হিংস্র কুফরী শক্তির কূটিল ষড়যন্ত্রের ফলেই এরূপ ঘটেছিল তাতে কোনই সন্দেহ ছিল না। সমস্ত বিশ্ব তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু সব কিছু উপেক্ষা করে এবং খুব তাড়াহুড়া করে অর্ধ ঘন্টা সময়ের ব্যবধানে এ পাঁচজন ইসলামী বীর মুজাহিদকে মিশরের কারাগারে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়..ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না ইলাইহে রাজেয়ূন।

সব কয়জন মর্দে মুমিন অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থিতি সহকারে এবং হাসি মুখে শাহাদাতের শরবত পান করেন। আল্লাহর যিক্‌র করতে করতে তারা মৃত্যু ....না, মৃত্যু নয়, পরকালীন শাশ্বত জীবন সাগ্রহে ও সোল্লাসে বরণ

করে নেন। আবদুল কাদের আওদাহ শহীদ সম্পর্কে জানা গিয়েছে, সর্বশেষে ফাঁসির আসামীর পোশাক পরিধান করে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন ; আমি কোন অপরাধ করিনি। আমার রক্ত অভিশাপ হয়ে চেপে বসবে আমার হত্যাকারীদের ওপর। অতপর তিনি হযরত খুবাইবের (রা) ন্যায় আরবী মৃত্যুঞ্জয়ী কবিতা পাঠ করতে করতে সুদৃঢ় পদক্ষেপে ফাঁসি মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন।

رحمه الله تعالى وسعه الغفران وسقى ضريحه

صيب الرضوان

www.bjilibrary.com

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

দ্বীন-ইসলামের বৈশিষ্ট্য

প্রথম অধ্যায়

আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের ধর্ম। এ জন্যে আমরা মনে মনে যেমন আনন্দ বোধ করি, তেমনি তা আমাদের গৌরবের বিষয়ও। কিন্তু তা সত্ত্বেও বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, ইসলামের হুকুম আহকাম আমরা বড় একটা জানি না। আমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা ইসলামের বড় বড় ও মোটা মোটা কথাগুলি জানবারও কিছু মাত্র প্রয়োজন বা আগ্রহ বোধ করে না। ইসলামের ব্যাপারে আমাদের আচরণ কিন্তু কোন অংশেই গৌরবের বিষয় নয়।

ইসলামের বিধান

ইসলামের বিধি-বিধান কতগুলি প্রাথমিক রীতিনীতি ও কতিপয় মতাদর্শের ওপর ভিত্তিশীল। এ প্রাথমিক রীতিনীতি ও মতাদর্শসমূহ কুরআন মজীদ থেকে প্রমাণিত। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এগুলো নিজে প্রকাশ ও প্রচার করেছেন। বস্তুত কুরআন ও রাসূলে করীমের (সা) উপস্থাপিত রীতিনীতি এবং মৌলিক মতাদর্শ ও বিধি-বিধানের সমষ্টিকেই আমরা ইসলামী শরীয়াত নামে অভিহিত করি। তাওহীদ, ঈমান, ইবাদাত—বন্দেগী, ব্যক্তিগত জীবন, সর্বপ্রকার পারস্পরিক কাজ-কর্ম, লেন-দেন, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে ইসলাম যেসব রীতিনীতি, আদর্শ ও কর্মবিধান উপস্থাপিত করেছে তারই সমষ্টির নাম ইসলামী শরীয়াত।

আর ইসলামের মৌলিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা হল ইসলামের হুকুম-আহকাম অনুযায়ী কাজ করা—ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে বাস্তবায়িত করা। তার কারণ এই যে, ইসলাম মূলতই একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মবিধান। ইসলামের হুকুম-আহকাম ভালভাবে জানা ও শেখা হবে এবং তার আদেশ-নিষেধ তথা আইন-বিধান, আদর্শ ও অনুষ্ঠানাদি পুরাপুরিভাবে বাস্তবায়িত হবে—ঠিক এ উদ্দেশ্যেই ইসলাম দুনিয়ায় এসেছে। এ দুনিয়ায় ইসলামের এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যই নেই। কাজেই ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী বাস্তবে কাজ

www.bjilibrary.com

করা না হলে কার্যত ইসলামকে ত্যাগ করা হয়। তখন মুখে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করা ও নিজেদের মুসলমান মনে করে গৌরব বোধ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াল।

ইসলামী বিধানের বিশেষত্ব

ইসলামের হুকুম-আহকাম দু'পর্যায়ে বিভাজ্য। ইসলামের কতকগুলো বিধান এমন যাকে আমাদের ভাষায় বলতে পারি ধর্মীয় বিধান। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস-আকায়েদ এবং আনুষ্ঠানিক ইবাদাত-বন্দেগী এ পর্যায়ে গণ্য। এছাড়া ইসলাম সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ, এবং বিভিন্ন সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক সংস্থাপন পর্যায়ে বিপুল রীতি-নীতি ও আইন-বিধান উপস্থাপিত করেছে। পারস্পরিক লেন-দেন, বিচার, শাস্তি ও প্রশাসন, ব্যক্তিগত ব্যাপারাদি, শাসনতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের উপস্থাপিত বিধি-বিধান কুরআন মজীদে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। কাজেই এ কথায় কোনই সন্দেহ নেই যে, ইসলাম যেমন (প্রচলিত ভাষায়) একটি ধর্ম, তেমনি একটি বৈষয়িক জীবন বিধানও। মসজিদ ও রাষ্ট্র, ধর্ম ও রাজনীতি ইসলামের এপিঠ ওপিঠ মাত্র। দ্বীন ও দুনিয়া এখানে একাকার। ইবাদাত ও সামাজিক তথা সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে ইসলামে কোনই পার্থক্য নেই। মুসলমানদের ধর্ম ইসলামেরই অংশ, রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় বিধান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে হযরত উসমান (রা) বলেছিলেন ঃ

ان اللّه ليزع بالسلطان مالا يزع بالقران

"আল্লাহ তায়ালা কুরআন দ্বারা যা করান না, তা রাষ্ট্র শক্তি দ্বারা সম্পন্ন করিয়ে থাকেন।"

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধানকে সামনে রেখে বিচার করলে হযরত উসমানের এ কথাটির যথার্থতা সুস্পষ্ট ও অকাট্য হয়ে উঠে।

ইসলামী আদর্শের এ বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও পরম

www.bjilibrary.com

সৌভাগ্যপূর্ণ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই ইসলাম অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের প্রত্যেকটি বৈষয়িক কাজেরই একটা পরকালীন দিক বা পরিণতি রয়েছে। মানুষের ধর্মীয় কাজ, সামাজিক কাজ, প্রশাসনিক কিংবা শাসনতান্ত্রিক বা রাষ্ট্রীয় কাজ—যেটাই হোক না কেন, দুনিয়ার বৈষয়িক জীবনে তার একটা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। হয় তার দ্বারা কোন কর্তব্য পালন করা হবে, কোন সমস্যার সমাধান করা হবে, সত্য প্রকাশ করা হবে কিংবা অসত্যের বিলোপ সাধন করা হবে, কোন অপরাধের বিচারে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হবে, কিংবা জওয়াবদিহির ব্যবস্থা করা হবে—যাই করা হোক না কেন, এ প্রতিটি কাজেরই যেমন একটি বৈষয়িক প্রভাব প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে তার একটা পরকালীন পরিণতি হওয়াও অনিবার্য। আর তা হলো পরকালীন সওয়াব কিংবা আযাব।

ইসলামী শরীয়াতের চরম লক্ষ্য হলো দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন। এ হিসেবে ইসলাম এক অবিভাজ্য শরীয়াত। তাকে যেমন বিভিন্ন খন্ডে ভাগ করা যায় না, তেমিন তার একটি বিধানকে অপর বিধান থেকে বিচ্ছিন্নও করা যায় না। ইসলামের সবকিছু মিলে এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য ব্যবস্থা। কাজেই তার একটা গ্রহণ ও অপরটা বর্জন যেমন ইসলামের পরিপন্থী এবং অবাঞ্ছনীয়, তেমনি তা করা হলে ইসলামের মূল লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য।

কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলেই এ কথার যথার্থতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। কুরআনের প্রতিটি বিধান এমন যে, তার বিরুদ্ধতা বা লংঘন এক সঙ্গে দু'টি পরিণতির উদ্ভাবক। একটি বৈষয়িক পরিণতি, আর অপরটি পরকালীন। যেমন ডাকাতির অপরাধ। এ অপরাধের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, কিংবা দেশ থেকে বহিষ্কার করণ। আর এ দু'টোই বৈষয়িক শাস্তি, এ দুনিয়ায় প্রতিফলিত পরিণতি। কিন্তু তার একটা পরকালীন শাস্তিও অপরিহার্য, আর তা হচ্ছে কঠিন আযাব। কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এ কথাই সোচ্চার হয়ে উঠেছে ঃ

إِنَّمَا جَزَٰؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ

www.bjilibrary.com

خِلَافٍ اَوْيُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۚ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

"যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিরুদ্ধতা করবে এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে, তাদের শাস্তি হচ্ছে ঃ হয় তাদের হত্যা করা হবে, না হয় শূলে দিয়ে মারা হবে, কিংবা বিপরীত দিক দিয়ে তাদের হাত ও পা কেটে দেয়া হবে, অথবা দেশ থেকে তাদের বহিষ্কার করা হবে। এ হচ্ছে তাদের জন্য বৈষয়িক লাঞ্ছনা। আর তাদের জন্য পরকালীন ব্যবস্থা হচ্ছে কঠিন আযাব।" —(মায়েদা ঃ ৩৩)

অশ্লীলতা, যৌনতা ও যেনা-ব্যভিচারের প্রচলন করা এবং নির্দোষ পবিত্র চরিত্রা মহিলাদের মিথ্যা-মিথ্যিভাবে চারিত্রিক দোষে দোষী করা অপরাধের এক সঙ্গে দু'টি শাস্তি রয়েছে। একটি শাস্তি দুনিয়ায় কার্যকর করতে হবে, আর অপরটি বাস্তবায়িত হবে পরকালে। কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

"যেসব লোক ঈমানদার লোকদের মধ্যে অশ্লীলতা, যৌনতা ও যেনা-ব্যভিচারের প্রচলন করতে চায় তাদের জন্যে দুনিয়া আখেরাত—উভয় স্থানেই তীব্র পীড়াদায়ক আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে।" -(আন নূর ঃ ১৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝

www.bjilibrary.com

"যেসব লোক অসতর্ক ঈমানদার নিষ্কলঙ্কচরিত্রা মহিলাদের চরিত্রে কালিমা লেপন করে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়। তাদের কঠিন আযাব দেয়া হবে যেদিন তাদের জিহ্বা, হাত ও পা প্রকাশ্যভাবে সাক্ষ্য দেবে। আর তা হবে তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল স্বরূপ। সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের উপযুক্ত কর্মফল পুরাপুরি দান করবেন এবং তখন তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই হচ্ছেন সুস্পষ্ট ও প্রকৃত সত্য—মহান সত্তা।" -(আন-নূর ঃ ২৩-২৫)

ইচ্ছামূলক নরহত্যার শাস্তি হচ্ছে দু'টি। একটি হলো 'কিছাছ' এটি দুনিয়ার শাস্তি। আর পরকালীন শাস্তি হচ্ছে জাহান্নামের আযাব।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى

"হে ঈমানদার লোকেরা, নরহত্যার অপরাধের দন্ডস্বরূপ কিছাছ তোমাদের জন্য লিখে দেয়া হয়েছে।"

অপর আয়াত ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا-

"যে লোক কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছা করে হত্যা করবে, তার শাস্তি হল জাহান্নাম—সেখানে সে চিরদিন থাকবে।"-(আন-নিসা ঃ ৯৩)

এমনিভাবে এমন কোন হুকুম বা বিধানই পাওয়া যাবে না ইসলামী শরীয়াতে যে বিষয়ে একই সঙ্গে ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন প্রতিফলের ব্যবস্থা করা হয়নি। তেমন কোন কথা পাওয়া গেলেও তা কুরআনেরই কোন মৌল বা সাধারণ নীতির অধীন গণ্য হবে। যেমন নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ۝ اَمَّا الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًاۢ بِمَا كَانُوْا

يَعْمَلُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝ (السجده : ١٨-٢٠)

"যে লোক মু'মিন সে কি কাফের ব্যক্তির সমান হতে পারে? না, তারা কখনো সমান হতে পারে না। তাই যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে জান্নাত। এটা মেহমানদারি হবে তাদের জন্যে। আর যারা ফাসেকী করেছে, তাদের শেষ পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। তারা যখনি তা থেকে বের হয়ে আসতে চেষ্টা করবে, তখনি তাদের সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদের বলা হবে যে, তোমরা সে জাহান্নামেরই স্বাদ আস্বাদন কর যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করছিলে।"

অন্য আয়াত ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ (النساء : ١٣-١٤)

"আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য-অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য। পক্ষান্তরে যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমালংঘন করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে ও তাদের জন্যে অপমানকর আযাব কার্যকর হবে।" -(আন-নিসা ঃ ১৩-১৪)

এ কথা সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী শরীয়াতের ইহকাল ও পরকালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত আইন-বিধান কিছুমাত্র অর্থহীন ও নিষ্ফল

নয়। ইসলামী শরীয়াতের বিধান দুনিয়া ও আখেরাতের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হওয়া তার প্রকৃতির অনিবার্য পরিণতি। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহকাল হচ্ছে পরীক্ষার ক্ষেত্র এবং তার পরিণতি বিনাশ ও বিলুপ্তি। আর পরকাল হচ্ছে স্থিতি ও প্রতিফল লাভের ক্ষেত্র। মানুষ তার কাজের জন্যে এ দুনিয়ায় বিশেষভাবে দায়িত্বশীল। পরকালে তাকে তার সব কাজের প্রতিফল অবশ্যই পেতে হবে, তা থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। অতএব সে যদি এ দুনিয়ার জীবনে ভালো কাজ করে, তা হলে তার শুভফল সে নিজেই পাবে। আর যদি কোন অন্যায় কাজ করে, তাহলে তার শাস্তি পরকালে তাকেই ভোগ করতে হবে। তাই বলে কোন কাজের বৈষয়িক প্রতিফল—ভাল বা মন্দ—এ দুনিয়ায়ই যদি কেউ পেয়ে যায়, তাহলে তদ্দরুন তার পরকালীন প্রতিফল পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে না। ইহকালীন ফল পরকালীন ফলকে প্রত্যাহার করে না। তবে যদি কেউ পাপের কাজ করার পর তওবা করে, তাহলে সে পরকালীন শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে অবশ্য।

ইসলামী বিধান ইহকাল ও পরকাল কেন্দ্রীক হওয়ার কারণে তা মানব রচিত সকল প্রকার আইন ও বিধান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শরীয়াতে দ্বীন ও দুনিয়া বৈষয়িক ও পরকালীন ফলাফল—একাকার ও পরস্পর সংমিশ্রিত হয়ে আছে। শরীয়াত দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রের প্রেক্ষিতেই বিধিবদ্ধ হয়েছে বলেই মুসলমান তা গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং সুখে ও অসুখে সমভাবে পালন করতে বাধ্য। কেননা তারা সমগ্র শরীয়াতের প্রতিই ঈমান এনেছে। তাদের এ ঈমানও রয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ ইবাদাতের পর্যায়ে গণ্য এবং তা-ই মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। আর এ আনুগত্যের জন্যে তারা আল্লাহর কাছে সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হবে। কেউ যদি অপরাধ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আল্লাহর অসন্তোষ ও পরকালীন আযাবের ভয়ে তা করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার ফলে সমাজে অপরাধের মাত্রা হ্রাস পাবে এবং সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা সঠিকভাবে রক্ষা পাবে।

মানব রচিত আইন ও বিধান এ বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত। তাতে এমন কোন ভাবধারা নেই যা মানুষকে তা অবশ্যই মেনে চলতে বাধ্য করতে পারে। কোন লোক যদি মানব রচিত আইন মানেও, তবে তা মানে শুধু ধরা পড়ে যাওয়ার

www.bjilibrary.com

ভয়ে। তাই যদি কেউ অপরাধ করেও আইনের কঠোর শাসন ও শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারবে বলে মনে করে, তাহলে তখন তাকে সে কাজ থেকে কেউই বিরত রাখতে পারে না। কোন নৈতিকতা বা ধার্মিকতাও তাকে আইন লংঘন থেকে ফিরাতে পারে না। ফলে মানব রচিত আইনের শাসনে জনগণের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে সাধারণ মানুষের চরিত্রও দুর্বল হয়ে যায়। আর নৈতিকশক্তির দুর্বলতার কারণে সমাজে ব্যাপক দুষ্কৃতি হতে থাকা ও বিরাট বিপর্যয় দেখা দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মানুষ প্রকাশ্যভাবে আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন তাদের দমন করার কোন শক্তিই অবশিষ্ট থাকে না।

শরীয়াতের বিধান অখণ্ড

শরীয়াতের বিধান অখণ্ড, তার বিভিন্ন অংশকে ভাগ করা যায় না, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কেননা, তা করা হলে কেবল যে শরীয়াতের মূল লক্ষ্যই বিনষ্ট হবে তাই নয়, শরীয়াতের সুস্পষ্ট অকাট্য দলীল এরূপ করতে নিষেধ করেছে। শরীয়াতের কিছু অংশ গ্রহণ এবং অপর কিছু অংশ বর্জন খোদ শরীয়াতের দৃষ্টিতেই নিষিদ্ধ, যেমন নিষিদ্ধ তার কিছু অংশ বিশ্বাস করা এবং অপর কিছু অংশ অবিশ্বাস করা। বরং সম্পূর্ণ শরীয়াতকে সামষ্টিকভাবে পালন করা, শরীয়াতের প্রতিটি হুকুমকে কাজে পরিণত করা— তার প্রতিটি অংশের প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই কর্তব্য। এরূপ করা না হলে কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে, যেখানে বলা হয়েছে ঃ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ (البقرة : ٨٥)

"তোমরা কি কুরআনের কতক অংশকে বিশ্বাস কর আর কতক অংশকে কর অবিশ্বাস? ...তাই যদি হয়, (তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে)

www.bjilibrary.com

তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এরূপ করবে তাদের শাস্তি হলো দুনিয়ার জীবনে চরম লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তাদের কঠিনতম আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।" -(বাকারা ঃ ৮৫)

শরীয়াতের কতক বিধান অনুযায়ী আমল করা এবং কতক বর্জন করাকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে কুরআন মজীদের আয়াতে, এ পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি উল্লেখ্য ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ لا اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

"আমরা যেসব সুস্পষ্ট-অকাট্য কথা ও হেদায়াতের বিধান নাজিল করেছি, কিতাবে লোকদের জন্যে তা সুস্পষ্টভাবে আমাদের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে দেয়ার পর যেসব লোক তা গোপন করে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন, অভিশাপ করে অন্যান্য অভিশাপকারীরাও। তা থেকে রক্ষা পাবে কেবল তারা যারা তওবা করেছে, নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করে নিয়েছে এবং সব কথা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছে। আমি তাদের এ তওবা কবুল করব এবং আমিই দয়াবান, তওবা গ্রহণকারী।" -(বাকারা ঃ ১৫৯-৬০)

এ আয়াতে 'গোপন করা' বলে বোঝানো হয়েছে আল্লাহর দেয়া বিধানের কতক অংশকে আমলে আনা এবং কতক অংশ বাদ দিয়ে চলাকে। কতককে মেনে নেয়া ও কতককে অমান্য করাও এ পর্যায়ে গণ্য। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিতেও এ কথাই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا لا اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ

www.bjilibrary.com

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝

"আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছেন তাকে যেসব লোক গোপন করে ফেলে এবং তা অতি সামান্য-নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে, তারা তাদের উদরে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভক্ষণ করে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য পীড়াদায়ক আযাব নির্দিষ্ট। এই লোকেরাই হেদায়াতের বদলে গোমরাহী এবং ক্ষমা-মার্জনার পরিবর্তে আযাব ক্রয় করে নিয়েছে। কি আশ্চর্য, তারা জাহান্নামের আযাব সহ্য করার সাহস করছে!"

–(বাকারা ঃ ১৭৪-১৭৫)

এ পর্যায়ের অন্যান্য আয়াত এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ (مائدة-٤٤)

"অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করবে না, ভয় করবে আমাকে। তোমরা আমার আয়াতসমূহ সাধারণ-নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করবে না। আর যে লোক আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা বা নীতি নির্ধারণ করে না, তারা সবাই কাফের।" –(মায়েদা ঃ ৪৪)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ

(النساء : ١٥٠ - ١٥١)

www.bjilibrary.com

"যেসব লোক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরী করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায়, বলে যে, আমরা কতকের প্রতি ঈমান রাখি ও কতককে অস্বীকার করি এবং এ দুয়ের মাঝখানে এক মধ্যম নীতি গ্রহণ করতে চায়, তারা সকলেই পাকাপোক্ত কাফের।"
-(আন-নিসা ঃ ১৫০-১৫১)

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ط..........................

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۝ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝ (المائده : ٤٨-٥٠)

"হে নবী, তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি পরম সত্যতা সহকারে, তা তোমাদের সম্মুখস্থ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণকারী এবং তাঁর হেফাযতকারী। অতএব লোকদের মধ্যে তুমি বিচার ফায়সালা কর আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুযায়ী। আর তুমি লোকদের মনোবাঞ্ছার অনুসরণ করতে গিয়ে তোমার কাছে আসা প্রকৃত সত্য থেকে দূরে সরে থেকো না। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্যেই আমরা বিধান ও পথ বানিয়ে দিয়েছি। ...তুমি তাদের মাঝে আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা কর। লোকদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করো না। তাদের থেকে সাবধান হয়ে থাক। কেননা, তারা তোমার প্রতি আল্লাহর নাজিল

www.bjilibrary.com

করা বিধানের কতক অংশ থেকে দূরে রেখে বিপদে ফেলতে পারে। তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা হলে জেনে রাখ, আল্লাহ তাদের কতক গুনাহের দরুন তাদের ওপর বিপদ আনতে চাহেন। আর অধিকাংশ লোকই ফাসেক। এ লোকেরা কি জাহেলিয়াতের বিধান ও শাসন পেতে চায়? অথচ বিশ্বাসী লোকদের জন্যে আল্লাহর অপেক্ষা উত্তম বিধান ও শাসন কেউই দিতে পারে না। (আল- মায়েদা ঃ ৪৮-৫০)

ইসলামী শরীয়াত আল্লাহ প্রদত্ত ও বিশ্বব্যাপক

ইসলামী শরীয়াত দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে নাযিল হয়েছে। তার রচয়িতা স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা। তিনি এ শরীয়াতের বিধান বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর নাযিল করেছেন এবং দুনিয়ার সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে তার ব্যাপক প্রচার করার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেছেন। বস্তুত ইসলাম সকল ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র, শ্রেণী, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র- সবকিছুর জন্যই বাস্তব ও কার্যকর বিধান। এক কথায় বললে বলা যায়, ইস-লাম হলো বিশ্ব-বিধান। দুনিয়ার আইনবিদ ও সমাজ তত্ত্ব বিশারদরা ইসলা-মের ব্যাপকতা ও গভীরতার কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। ইসলামের ন্যায় ব্যাপক, গভীর ও বাস্তব কর্মোপযোগী নির্ভুল-নিখুঁত ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি বিধান রচনা করা আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন সমাজ দার্শনিকের পক্ষেই সম্ভবপর হয়নি। নিম্নোদ্ধৃত আয়াত দুটি ইসলামের এ ব্যাপকতা ও বিপ্লবী ভূমিকার কথাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছে। রাসূলের জবানীতে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا -

"হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" -(আরাফ ঃ ১৫৮)

هُوَ الَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ (التوبة - ٣٣)

www.bjilibrary.com

"সেই মহান আল্লাহই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য জীবন-বিধানসহ পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সর্বপ্রকার বিধান-ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে তোলে।" (তওবা ঃ ৩৩)

ইসলামী শরীয়াত পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত

শরীয়াত আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এ শরীয়াত যেমন পূর্ণাঙ্গ, তেমনি শাশ্বত। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ শরীয়াত নাযিল হয়। হযরত মুহাম্মাদ (সা)- কে রাসূল রূপে বরণ করার সময় থেকে তা নাযিল হতে শুরু করে এবং তাঁর ইন্তেকালের সংগে সংগে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। রাসূলে করীমের প্রতি সর্বশেষ যে আয়াতটি নাযিল হয়, তা হলো ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۚ (المائدة : ٣)

"আজকের এই দিনে তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ পরিণত করে দিলাম, আমার যে নিয়ামত তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হচ্ছিল তা আজ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে আমি মনোনীত করলাম।" —(মায়েদা ঃ ৩)

কুরআনের এ ঘোষণা ইসলামী শরীয়াতের পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য ও চূড়ান্ত। সেই সঙ্গে এ কথাও স্মরণে রাখতে হবে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) খাতামুন্নাবীয়ীন—সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। কুরআন মজীদেই ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۚ (الاحزاب : ٤٠)

"মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারুর পিতা নয়। বরং আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।" —(আহযাব ঃ ৪০)

ইসলামী শরীয়াত যে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক, তা তাকে সামনে রেখে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাতে যেমন কোন ত্রুটি নেই তেমনি নেই কোনরূপ

www.bjilibrary.com

অসম্পূর্ণতা। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র—মানব জীবনের এ সব কয়টি দিক সম্পর্কেই তাতে প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে অনুসরণ করা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে লেন-দেন করার ব্যাপার থেকে শুরু করে সমাজ-শাসন, বিচার-আচার, রাষ্ট্র পরিচালনা ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করা—এ সকল পর্যায়ের জন্যেই ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। তেমনি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত কার্যাবলীর বিধানও তাতে সুস্পষ্ট রূপে বর্তমান।

এ শরীয়াত বিশেষ কোন সময়ের জন্যে আসেনি। বিশেষ কোন যুগ বা কালও তার জন্যে নির্দিষ্ট নয়। মূলত তা সর্বকালের, সর্বযুগের এবং সকল অবস্থায়ই প্রযোজ্য এক অলোক-সামান্য বিধান। ইসলামের বিধানসমূহের মূল্যায়নেই এ কথার সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তার কোন একটির ওপরও যুগ-পরিবর্তনের একবিন্দু প্রভাব পড়েনি, কোন একটি বিধানও কোন কালেই 'পুরাতন' বা 'প্রয়োগ-অযোগ্য' বিবেচিত হবে না। কালের যতই পরিবর্তন হোক না কেন, তার অবতীর্ণ হওয়ার যত শতাব্দীই অতিবাহিত হোক না কেন কালের অতল গর্ভে, শরীয়াতের কোন একটি বিধানই 'সেকেলে' বিবেচিত হবে না। বরং যে কোন সময়ই তার পর্যালোচনা করা হবে, তা সম্পূর্ণ নতুন, আধুনিক ও আনকোরা বলে মনে হবে। তার 'নতুনত্ব' কোন সময়ই ম্লান হবে না। কেননা, তা রচিত ও অবতীর্ণই হয়েছে চিরকালীন, শাশ্বত, সর্ব ক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে। এ কারণে তা কোন পরিবর্তন গ্রহণ করতে রাজী নয়। কোনরূপ রদ-বদল বা পরিবর্তন পরিবর্ধনের এক বিন্দু অবকাশও নেই তাতে। কিন্তু মানব-রচিত আইন বা বিধানের এরূপ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তা কালের ঘাত প্রতিঘাতে যেমন বদলে যায়, তেমনি অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাতেও নানাবিধ পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। ফলে সেখানে নিত্য নতুন আইন তৈরী করার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ইসলামী শরীয়াতের উন্মেষ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে জানতে পেরেছি। এক্ষণে মানব রচিত আইন-বিধানের উন্মেষ সম্পর্কে দু'টি কথা বলবার আছে।

সমাজ ও জাতির প্রয়োজনে মানব রচিত আইন উদ্ভূত হয়। সে আইনই সমাজকে গঠন ও পরিচালিত করে। তারই ভিত্তিতে চলে শাসন-শৃঙ্খলার যাবতীয় কাজ। সেখানে আইন যেহেতু সংকীর্ণ, তাই সমাজের সংকীর্ণ

www.bjilibrary.com

ক্ষেত্রেই তা কার্যকর হয়ে থাকে। অবশ্য সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের তাকিদে তাতেও বিকাশ সাধিত হয়। প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আইনের ধারা-উপধারাও সংযোজিত হয়। নিত্য নতুন দৃষ্টিভংগী জেগে উঠে, প্রয়োজনও নানা রূপ নিয়ে প্রকট হয়ে উঠে। তাই আইনও তার সাথে তাল রেখে শাখায় প্রশাখায় বিকাশ লাভ করতে থাকে। সমাজ চিন্তা ও জ্ঞানগবেষণায় যতই অগ্রগতি লাভ করে, সমাজ শাসক ব্যক্তিরা ততই নিত্য নতুন আইন রচনা করে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। এই শাসকরাই সেখানে আইন রচনা ও তাতে রদবদলের নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে।

এ কারণে বলা চলে সমাজই আইন রচনা করে। রচিত আইনের সাহায্যেই সমাজের প্রয়োজন পূরণ করা হয়। তাই আইন হয় সমাজের প্রয়োজনের অধীন ও অনুসারী এবং সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের ওপরই আইনের অগ্রগতি ও বিকাশ নির্ভরশীল।

আইন-শাস্ত্রবিদরা যেমন বলেছেন, প্রাচীনতম কালে পরিবার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই আইন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। পরে গোত্রীয় জীবনে তা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। অতপর রাষ্ট্র গঠনের কারণে তা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে। অষ্টম শতকে মানব রচিত আইন এক নতুন পর্যায়ে পদার্পণ করে। এ সময়ে নতুন নতুন দার্শনিক সমাজতাত্ত্বিক মতাদর্শ রচিত ও প্রচারিত হয়। সে সময় থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত মানব রচিত আইনে বড় বড় পরিবর্তন ও বিকাশ সূচিত হয়েছে। বর্তমানে আইন এসব অভিনব মতাদর্শের উপর ভিত্তিশীল, যার কোন অস্তিত্ব অতীতকালে ছিল না।

শরীয়াত ও মানব রচিত আইনের প্রকৃতিগত পার্থক্য

শরীয়াত ও মানব রচিত আইনের পটভূমি আলোচিত হওয়ার পর এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, শরীয়াত ও মানব রচিত আইন কোন দিক দিয়েই এক প্রকার বা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত দিক দিয়েই বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। তবুও এ কথা সত্য যে, শরীয়াতও মানব রচিত আইনের মতই বিকাশ লাভ করেছে এবং অনুরূপ গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। শরীয়াত প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানব রচিত আইনের মতই

www.bjilibrary.com

সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ লাভ করেছে, কিন্তু তা আধুনিক মতাদর্শ সম্বলিত আইনের মত নয়। আর মানব রচিত আইন আধুনিক মতাদর্শ সহকারে আত্মপ্রকাশ করেছে অনেক পরে। হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, তার আগে নয়।

শরীয়াত ও মানব রচিত আইনের মৌলিক পার্থক্য

শরীয়াত ও মানব রচিত আইনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এ পার্থক্য তিনটি দিক দিয়ে বিচার্য ঃ

শরীয়াত আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে। কিন্তু আইন মানুষের রচিত। আর আইনে যেহেতু উহার রচয়িতার মনোভাব, মানসিকতা ও গুণাগুণের প্রতিফলন ঘটে অনিবার্যভাবে, এ কারণে মানব রচিত আইনে উহার রচয়িতার অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটির প্রতিফলন হওয়া অপরিহার্য। মানুষের অক্ষমতা, দুর্বলতা ও বুদ্ধি-বিবেচনার সসীমতা তার রচিত আইনেও প্রকট হয়ে উঠে। আর এ কারণেই মানব-রচিত আইন পরিবর্তন সাপেক্ষ হয়ে থাকে। এ পরিবর্তনকে ক্রমবিবর্তনও বলা যেতে পারে। যেমন সমাজ ধীরে ধীরে এক অচিন্তপূর্ব পর্যায়ে বিকাশ লাভ করে, কিংবা অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, আইনও অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকে। অতএব বলা যেতে পারে যে, মানব রচিত আইন চির ত্রুটিপূর্ণ। তা কখনও পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে না। কেননা, তার রচয়িতাই কোন সময় সম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। আইন উপস্থিত সমস্যাকে সামনে রেখেই রচনা করা হয়। আইন রচয়িতা আইন রচনাকালে খুব বেশী হলেও উপস্থিত সমস্যা ও পরিস্থিতিকেই বিচার-বিবেচনা করে। ভবিষ্যতে কি অবস্থা দাঁড়াবে, তা চিন্তা ও বিবেচনা করার কোন ক্ষমতা তার থাকে না। তাই উপস্থিত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কিংবা সাম্প্রতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে হয় সে আইনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, না হয় সে আইন অপর্যাপ্ত ও সামঞ্জস্যহীন প্রমাণিত হয়। তখন তাতে সংশোধনী আনা কিংবা সেটাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আইন রচনা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

কিন্তু শরীয়াতের এরূপ অবস্থা কখনো হয় না। কেননা, তার রচয়িতা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তাঁর রচিত আইনও তেমনি বিরাট এবং মহান মর্যাদা সম্পন্ন।

www.bjilibrary.com

সে আইন বর্তমান ও ভবিষ্যতকে সামনে রেখে সার্বিক প্রয়োজন পূরণার্থেই রচিত হয়েছে। কালের পরিবর্তন ও অবস্থার বিবর্তনের ফলে শরীয়াতের উপর কোন প্রভাবই প্রবর্তিত হতে পারে না। বর্তমান ও ভবিষ্যত সে আইনে একাকার।

দ্বিতীয় দিক হল, মানব-রচিত আইন সাময়িক নিয়ম পদ্ধতির অনুসারী হয়ে থাকে। সমাজই তা রচনা করে তার উপস্থিত সংগঠন সংস্থার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপস্থিত প্রয়োজন পূরণার্থে। তাই তা অনিবার্যভাবে সমাজের লেজুড় হয়ে থাকে, সমাজের পিছনে পিছনে চলতে বাধ্য হয়। অথবা তা আজ হয়ত সমাজের সাথে সমানে তাল মিলিয়ে চলে, কিন্তু কাল তা সমাজ থেকে অনেক দূরবর্তী জিনিসে পরিণত হয়ে পড়ে। কেননা, সমাজ-বির্বতনের দ্রুততার সাথে পাল্লা দিয়ে তো আর মানব রচিত আইন স্বতই পরিবর্তিত হতে পারে না। এ আইনের নিয়ম-পদ্ধতি সমসাময়িক সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় বটে, কিন্তু সমাজ পরিস্থিতিতে পার্থক্য বা পরিবর্তন দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আইনেও পরিবর্তন সাধন অপরিহার্য হয়ে পড়তে বাধ্য।

শরীয়াতের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তার নিয়ম-বিধি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই রচনা করেছেন, রচনা করেছেন চিরন্তনের নিয়ম ও বিধান হিসেবে। এবং তা নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ও তাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্য সহকারে। অতএব শরীয়াত ও মানব রচিত আইন এদিক দিয়ে এক যে, উভয়টিই সমাজ সংগঠনের উদ্দেশ্যে রচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে এ দুয়ের পার্থক্য এখানে যে, শরীয়াতের বিধি-বিধান শাশ্বত ও চিরন্তন, তা কোনরূপ রদবদল বা পরিবর্তন সংশোধন গ্রহণ করে না। শরীয়াতের এ বিশেষ বিশেষত্বের কারণে নিম্নোক্ত কথাগুলো অনিবার্য হয়ে পড়ে ঃ

এক. শরীয়াতের বিধি-বিধান ও কায়দা-কানুন এমন সাধারণ পর্যায়ের ও সার্বিক ভাবধারা সম্পন্ন হতে হবে যেন কালের গতির সাথে সাথে নবোদ্ভূত প্রয়োজন ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তা উপযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, সমাজ যেন তার সাহায্যে বিকাশ ও অগ্রগতি লাভ করতে পারে—সামাজিক প্রয়োজন যত বিচিত্র ও বিপুল হোক না কেন, সর্বাবস্থায় সে আইন যেন যথেষ্ট বিবেচিত হয়।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয়. শরীয়াতের বিধান ও শরীয়াতী আইনের ধারাসমূহ যেন এত উচ্চমানের ও অগ্রসরমান ভাবধারা সম্পন্ন হয় যার ফলে শরীয়াত কোন সময়ই এবং কোনকালেই 'পুরাতন' হয়ে যায় না। সর্বাবস্থায়ই যেন তা সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে চলতে পারে। মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এ দু'টি দিক দিয়ে ইসলামী শরীয়াতের যাচাই ও পরখ করা হলে স্পষ্ট দেখা যাবে যে, শরীয়াত এ দু'টি মূলনীতির মানদণ্ডে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হতে পারে। বরং এ দু'টিই হল শরীয়াতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। শরীয়াতের প্রত্যেকটি আইন ও বিধান বস্তুতই সাধারণ প্রেক্ষিতে রচিত। বরং তা এদিক দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। আর তা এতই উন্নতমানের বিধান, যতটা উন্নত পর্যায়ে মানুষ চিন্তা করতে পারে না।

শরীয়াত অবতীর্ণ হয়েছে প্রায় চৌদ্দ শত বছর পূর্বে। সমাজ ও জাতিসমূহের অবস্থা এর মধ্যে অসংখ্যবার অসংখ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অবর্ণনীয়ভাবে বিকাশ লাভ করেছে ও মোড় নিয়েছে, মানুষের মতামত ও দৃষ্টিকোণ দৃষ্টিভংগীর বহু পরিবর্তন ঘটেছে, বহু আবিষ্কার উদ্ভাবনী সম্ভব হয়েছে, যদিও পূর্বে তা মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল। আইন রচনার নিয়ম-প্রণালী ও পন্থা-পদ্ধতিও অনেকবার বিবর্তিত হয়েছে এবং এ সবের মাধ্যমে তা পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছে। এ পরিবর্তন এত বেশী ও বিরাট যে, প্রাচীন কালের আইন রচনা ও আধুনিক কালের আইন রচনার ধরন-ধারণের মাঝে কোন সম্পর্ক বা সাদৃশই লক্ষ্য করা যায় না। আর এর কোন দিক দিয়েই শরীয়াতের সাথে তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। শরীয়াত এক বিন্দু পরিবর্তন গ্রহণ না করেও তার নীতি ও পদ্ধতি সহকারে আধুনিকতম সমাজের সব চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। স্পষ্ট মনে হবে যে, এ নীতি-পদ্ধতি যেন বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতেই বিরচিত।

এ হলো ইতিহাসের সাক্ষ্য এবং এ সাক্ষ্য শরীয়াতেরই বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআনের কয়েকটি আয়াত এবং হাদীসের দু'একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

www.bjilibrary.com

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ (ال عمران : ١٥٩)

"তুমি লোকদের সাথে জাতীয় ও সামষ্টিক বিষয়ে পরামর্শ কর।"
(আলে-ইমরান ঃ ১৫৯)

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ (الشورى - ٣٨)

"তাদের নীতি হলো পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় জাতীয় ও সামষ্টিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।" (আশ-শুরা ঃ ৩৮)

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانَ -
(سورة المائدة)

"এবং তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর নেক ও তাকওয়া সম্পন্ন কাজের ব্যাপারে এবং কোনরূপ সহযোগিতা করো না গুনাহ ও সীমা-লংঘনমূলক কাজে।" (সূরা আল-মায়েদা ২)

রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لاضرر ولا ضرار فى الاسلام

"ইসলামী বিধানে না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নিয়ম আছে, না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নীতি।"

কুরআন মজীদ ও হাদীসের ঘোষিত এ নীতি কয়টি অতি সাধারণ (Common) সার্বিক ও সর্বাবস্থায় প্রয়োগকারী ব্যবস্থা। প্রথমোক্ত আয়াতাংশদ্বয় শূরা—পরামর্শ গ্রহণ পদ্ধতির—প্রবর্তন করেছে। দ্বিতীয় আয়াতটি ন্যায় ও ভালো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পাপ, অন্যায় ও সীমালংঘনমূলক কাজে পূর্ণ অসহযোগিতা করার নীতি উপস্থাপিত করেছে। আর হাদীস অংশের প্রতিপাদ্য হল, না নিজে ক্ষতি স্বীকার করবে, না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এতে করে শরীয়াত এক চরমোন্নত মানের বিধান—যে পর্যন্ত উন্নীত হওয়া মানুষের চিন্তা কল্পনার পক্ষে ধারণাও করা যায় না—বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে।

তৃতীয়, শরীয়াতের লক্ষ্য হলো সমাজ সংগঠন ও পরিচালন। আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তি তৈরী করা, আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপন ও সর্বাঙ্গ সুন্দর জগত গড়ে

www.bjilibrary.com

তোলা। ঠিক এ কারণেই কুরআনের আয়াত ও বিধানসমূহ নাযিল হওয়ার সময়ই জগতের সাধারণ অবস্থা থেকে উন্নত মানের হয়ে নাযিল হয়েছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত তা অনুরূপ উন্নত মানের বিধানরূপেই প্রতিপন্ন হচ্ছে। শরীয়াতী বিধানে এমন সব মূলনীতি ও মৌল মতাদর্শ উপস্থাপিত হয়েছে যা অ-ইসলামী জগতের ধারণায় আসতে পারেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ও বিকাশলাভের এ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেও জগত তার অনেক পশ্চাতেই পড়ে রয়েছে বলে স্পষ্ট মনে হয়। ঠিক এ কারণেই দুনিয়ার মানুষের জন্য শরীয়াত রচনার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজ হস্তে গ্রহণ করেছেন এবং এক পূর্ণাঙ্গ বিধানকে খণ্ড খণ্ড ও অংশ অংশ হিসেবে নাযিল করেছেন, যেন জনগণ তা পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। ইসলামের বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব পুরাপুরি অনুভব ও অনুধাবন করতে সক্ষম হয় এবং এভাবেই ইসলামের মহান উন্নত মান অস্থায়ী নিজেদের উন্নত এবং তার পূর্ণতার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিজেদেরও পূর্ণ করে গড়ে তুলতে পারে।

মানব রচিত আইন মূলত সমাজ-সংগঠনের প্রয়োজন অনুযায়ী রচিত হয়। সমাজকে সম্মুখের দিকে—অগ্রগতির দিকে চালিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয় না। ফলে এ আইন সব সময় সমাজের পেছনে পেছনে চলে। এ আইন থাকে সমাজ-বিকাশের অধীন, তার লেজুড় হয়ে। অবশ্য বর্তমানে মানব রচিত কোন কোন বিধান সমাজ গঠন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে। ফলে কয়েকটি রাষ্ট্র আইনকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন আন্দোলন শুরু করেছে। তা নির্দিষ্ট দিকে ও উদ্দেশ্যে সমাজকে পরিচালিত করতে চায়। রাশিয়া, চীন, আরমানিয়া, ইটালী প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলো এ পর্যায়ে উল্লেখ্য। এভাবে মানব রচিত আইন বিধান একালে—চৌদ্দশ' বছর পরে—এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে, যে পর্যায়ে প্রথম সূচনা হয়েছিল ইসলামী শরীয়াত বিধানের।

এছাড়া আরো তিনটি মৌলিক দিক দিয়ে শরীয়াত ও মানব রচিত আইনের মাঝে পার্থক্য দেখানো যায়।

(১) পূর্ণাঙ্গতা ও পরিপূর্ণতা। শরীয়াত পূর্ণাঙ্গ বিধান। তা প্রথম সূচনা থেকেই পরিপূর্ণ। তার কোথায়ও এক বিন্দু অসম্পূর্ণতা নেই। আইনের ক্ষেত্রে মানুষের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, তা শরীয়াত যথাযথভাবে পূরণ করতে

www.bjilibrary.com

সক্ষম। নবোদ্ভূত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তা কোনক্রমেই অপূর্ণ বা নব প্রয়োজন পূরণে অক্ষম প্রমাণিত হতে পারে না। তা বর্তমানেও যেমন যথেষ্ট, ভবিষ্যতেও তেমনি। কিন্তু মানব রচিত আইন ও বিধান প্রতি মুহূর্ত অসম্পূর্ণ প্রমাণিত হচ্ছে। নতুন প্রয়োজনের তাগীদ পূরণে তা সদা পরিবর্তন ও সংশোধন সাপেক্ষ বিবেচিত হতে বাধ্য।

(২) অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যশীলতা। শরীয়াত সমাজ বিবর্তনের যে কোন ধাপের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা সমাজের সাথে তাল রেখে সমানভাবে চলতে সক্ষম। তাতে এমন সব মৌলনীতি চির বর্তমান যা সমাজের উচ্চতম মানকে রক্ষা করতে পারে—সমাজ যতই উচ্চস্তরে আরোহণ করুক না কেন। কিন্তু মানব রচিত বিধান সেরূপ নয়।

(৩) চিরস্থায়ীত্ব ও কালজয়ী হওয়া। শরীয়াত কালজয়ী, চিরকালীন। তার মূলনীতিসমূহ কখনই পরিবর্তন বা সংশোধনের মুখাপেক্ষী হয় না, জনগণের জীবন বা দেশ কালের অবস্থা যতই পরিবর্তিত হোক না কেন, কালস্রোত যতই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে যাক না কেন, তা কোন দিনই ফুরিয়ে যাবে না, পুরাতন বিবেচিত হবে না। তা সর্বকালের সর্বযুগের চাহিদা পূর্ণ মাত্রায় মেটাতে সক্ষম। মানব রচিত আইনের এ বৈশিষ্ট্য নেই।

শরীয়াতের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

মানুষের সকল অবস্থায় তাদের মাঝে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই শরীয়াতের আবির্ভাব। মানুষের কেবল বৈষয়িক জীবন পুনর্গঠনই নয়, তাদের পরকালীন জীবনকে সুষ্ঠু সুন্দর পরিণতি সম্পন্ন করে তোলাও শরীয়াতের লক্ষ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, শরীয়াত বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়ের বিধি সম্পন্ন কোন বিধান নয়। সকল কালের সকল অবস্থার সামান্য ও নগণ্য খুঁটিনাটি বিষয়ে তাতে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। শরীয়াত মূলত সাধারণ মূলনীতি উপস্থাপিত করেছে এবং সকল পরিবর্তিত অবস্থায় এ নীতিসমূহই মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী খুঁটিনাটি ব্যবস্থা দিয়ে থাকে। মানব রচিত আইন ভিন্নতর। তা সাময়িক অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে রচিত হয় বলে তাতে থাকে সব খুঁটিনাটি ব্যবস্থা ও বিধি।

www.bjilibrary.com

শরীয়াতের এ সামষ্টিক মূলনীতিসমূহ ইসলামী আইন প্রণয়নের জন্যে সাধারণ নিয়ম প্রবর্তন করে। তা মানুষের সামনে ইসলমী আইন প্রণয়নের একটা সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য সাধারণ পদ্ধতি উপস্থাপিত করেছে। এ পর্যায়ের বিস্তারিত নিয়ম-বিধান প্রণয়নের দায়িত্ব উলীল আমরদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তারাই প্রয়োজন অনুপাতে খুঁটিনাটি আইন ও নিয়ম-বিধি শরীয়াতের মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে রচনা করে থাকে। এভাবেই ইসলামী বিধানের অসম্পূর্ণতা দূরীভূত ও অভাব পূরণ হয়ে থাকে। তারাই তার সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও ব্যবহারিক কল্যাণ প্রকাশ ও উদ্ভাবন করে থাকে।

ইসলামী আইন প্রণয়নে শরীয়াত যে পন্থা অবলম্বন করেছে, তা মাত্র একটি। সে পন্থাটিও শরীয়াতের বৈশিষ্ট্যের সাথে সর্বদিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উচ্চমান, পূর্ণত্ব ও চিরস্থায়িত্ব প্রভৃতি গুণ তার মধ্যেও সদা বর্তমান। উচ্চমান ও পূর্ণত্ব মানুষ ও সমাজ সম্পর্কিত মতাদর্শের ক্ষেত্রে এমন অকাট্য মূলনীতির দাবী করে যা সুষ্ঠু সুন্দর সমাজ গঠনে সক্ষম। সেখানে নির্ভুল সুবিচার, সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা, ব্যক্তিদের পরস্পরে দয়া ও স্নেহ-মমতা এবং সঠিকভাবে তাদের পরম কল্যাণের পথে চালাবার ভাবধারা চির জাগরুক হয়ে থাকবে। আর চিরস্থায়িত্বের গুণ দাবী করে যে, কোন মূল আইনই এমনভাবে সাময়িক হবে না যে, সময় ও ক্ষেত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাতে পরিবর্তন ও সংশোধন অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে।

আইন-প্রণয়নে উলীল আমর-এর অধিকার

শরীয়াত ইসলামী আইনের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু এ অধিকার নিরংকুশ নয়, নিজ ইচ্ছামত যে কোন আইন রচনার অধিকার তাদের দেয়া হয়নি আদৌ। উলীল-আমর-এর এ অধিকার শর্তাধীন এবং সীমাবদ্ধ। যত আইনই রচনা হোক না কেন, তা অবশ্য শরীয়াতের মূলনীতি ভিত্তিক এবং শরীয়াতের মৌল ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এভাবে উলীল-আমরকে যে আইন রচনার ক্ষমতা ও অধিকার দেয়া হয়েছে, তা দু'টি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

www.bjilibrary.com

একটি হল প্রয়োগমূলক বিধান। ইসলামী শরীয়াতের যাবতীয় মূলনীতি কার্যকর করার জন্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তৈরী করা। এ পর্যায়ের আইন প্রণয়ন একালের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রীপরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবাবলীর অনুরূপ। কেননা, মূল আইন বাস্তবায়িত ও কার্যকর করে তোলাই তাদের প্রধান দায়িত্ব।

আর দ্বিতীয় প্রশাসনমূলক আইন-বিধান প্রণয়ন। এ পর্যায়ের আইন দ্বারা সমাজ-সংগঠন ও সমাজে নিয়ম-শৃংখলা বিধান করা হয়। শরীয়াতের বিধানের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের ব্যাপারে যেসব প্রয়োজন দেখা দেয়, তা এর সাহায্যেই পরিপূরণ করা হয়। তার জন্যে কোন বিশেষ মূলনীতি নির্দিষ্ট নেই। এ ধরনের আইন প্রণয়নের সর্বপ্রথম শর্ত হল শরীয়াতের সাধারণ মূলনীতি ও তার অন্তর্নিহিত ভাবধারার সহিত পুরাপুরিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

উলীল আমর-এর সীমালংঘন পরিস্থিতি

উলীল আমর যখন পর্যন্ত তার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা অবশ্যই নির্ভুল হবে। আর কোন দিক দিয়েই যদি সীমালংঘন করা হয়, তাহলে তা অবশ্যই বাতিল বিবেচিত হবে। উলীল আমর যদি শরীয়াতের মূলনীতি ও ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে কোন কাজ করে, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বা কোন ফরমান জারি করে, তবে তা মেনে নেয়া ও পালন করা অবশ্য কর্তব্য হবে। আর শরীয়াতের বিরুদ্ধতা করা হলেও তার আইন প্রণয়নে সীমালংঘিত হলে তার কাজ যেমন বাতিল গণ্য হবে, তেমনি তা মেনে নেয়া ও অনুসরণ করা চলবে না। এ পর্যায়ের কোন নির্দেশও পালন করা যাবে না বরং তা অমান্য করাই কর্তব্য।

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের নির্দেশসমূহ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

এরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ –

(النساء – ٥٩)

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, অনুসরণ কর রাসূলের এবং তোমাদের দায়িত্বশীল লোকদেরও (মানো)। কোন বিষয়ে যদি তোমাদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট ফিরিয়ে দাও।" (ও মীমাংসা করে নাও) -(আন-নিসা ঃ ৫৯)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ ط

(الشورى : ١٠)

"যে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হবে, তার চূড়ান্ত মীমাংসা আল্লাহর নিকট থেকে নিতে হবে।" -(আশ-শুরা ঃ ১০)

মূলত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানতেই আমরা বাধ্য। আর তাঁরই নির্দেশে রাসূল ও উলীল আমরকে মেনে চলাও আমাদের কর্তব্য। আল্লাহর আনুগত্য করা কর্তব্য আল্লাহর নির্দেশেই। আর রাসূল ও উলীল আমরকে মেনে চলাও আল্লাহর নির্দেশেই কর্তব্য।—না রাসূলের নির্দেশে, না উলীল আমর-এর নিজের নির্দেশে। কাজেই উলীল আমরই যদি আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধতা করে, তাহলে তার কথা বাতিল হবে এবং তার আনুগত্য বা অনুসরণ করা কিছুতেই জায়েয হবে না। রাসূলে করীম (সা) এ পর্যায়ে তাকীদ দিয়ে বলেছেন ঃ

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق

"আল্লাহর নাফরমানী করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যেতে পারে না।"

انما الطاعة فى المعروف

কেবল মাত্র ন্যায়, ভালো ও শরীয়াতসম্মত ব্যাপারেই কারুর আনুগত্য করা যেতে পারে, তার বাইরে নয়। আর উলীল আমরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

من امركم منهم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة

"উলীল আমরদের মধ্যে যদি কেউ গুনাহের কাজ করতে আদেশ করে—যে কাজে আল্লাহর নাফরমানী হয়—তাহলে তা শুনা যাবে না, মানাও যাবে না।"

www.bjilibrary.com

দেশ শাসকদের ভূমিকা

প্রায় মুসলিম দেশের শাসকরাই অতীত যুগসমূহে আইন প্রণয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তারা নিজেদের দেশে ইউরোপীয় আইনকে হুবহু জারি ও অনুসরণ করতে থাকেন। শাসনতান্ত্রিক, বিচার বিভাগীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায় সংক্রান্ত ইউরোপীয় আইনকে প্রবর্তন করেন। ওয়াক্ফ ও শোফ্য়া প্রভৃতি দু'একটি ব্যাপার ছাড়া ইসলামের কোন আইনকেই তাঁরা নিজেদের দেশে চালু থাকতে দেননি।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এসব আইনের অনেকগুলোই শরীয়াতের আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল। শরীয়াতের নিয়মের সুস্পষ্ট পরিপন্থী তেমন ছিল না। সেই সংগে এ কথাও সত্য যে, তার কোন কোনটি শরীয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। তার মৌলনীতিও শরীয়াতের বরখেলাফ ছিল। এ পর্যায়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি দণ্ডবিধির উল্লেখ করা যেতে পারে। ইউরোপীয় আইন কোন কোন অবস্থায় যেনা-ব্যভিচারকে অপরাধ বলে গণ্য করেনি। মদ্যপান সে আইনে সম্পূর্ণ আইনসম্মত। অথচ ইসলামী আইনে যেনা-ব্যভিচার সর্বাবস্থায়ই হারাম, মদ্যপানও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইউরোপীয় আইনে তা নির্দোষ কাজ বটে। যদিও নিরংকুশ ও শর্তহীনভাবে নয়, বরং বিশেষ সীমার মধ্যে ও বিশেষ শর্তের অধীন।

ইসলামী দেশে ইউরোপীয় আইন প্রবর্তনের কারণ

কেউ কেউ মনে করেছেন যে, কোন ইসলামী দেশে ইসলামী আইনের পরিবর্তে ইউরোপীয় আইন জারি হওয়ার একমাত্র কারণ হল প্রয়োজনীয় ইসলামী আইনের অভাব। কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। ইসলামী আইন ও শরীয়াত সম্পর্কে চরম অজ্ঞতাই এ ধরনের মনোভাবের মূলে কাজ করছে। কেননা ইসলামী শরীয়াতের—তথা ইসলামী ফিকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা প্রাথমিক মূলনীতি, মতাদর্শ ও বিধানসমূহ যদি একটি গ্রন্থাকারে একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করা হয়, তা হলে কার্যকর আইনের এক উচ্চতর মানের সঞ্চার তৈরী হতে পারে। আর এটাও অমূলক নয় যে, এ ধরনের একটি আইন-সংগ্রহ গ্রন্থাকারে পাওয়া গেলে তা কেবল ইসলামী দেশসমূহেই নয়-অমুসলিম দেশসমূহেও অনুসৃত ও প্রবর্তিত হতে পারত।

www.bjilibrary.com

ইসলামী দেশসমূহে ইউরোপীয় আইন-কানুন প্রবর্তিত হওয়ার আসল কারণ হলো সাম্রাজ্যবাদ, ইউরোপীয় প্রভাব প্রতিপত্তি এবং মুসলিম মনীষীদের নিষ্ক্রিয়তা ও অকর্মন্যতা। কোন কোন ইসলামী দেশে ইউরোপীয় আইন প্রবর্তিত করা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও প্রতিপত্তির জোরে (অবিভক্ত) বৃটিশ ভারত, উত্তর আফ্রিকা ও অন্যান্য কতিপয় দেশের নাম এ পর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব দেশের আভ্যন্তরীণ ও নৈতিক দুর্বলতার দরুনই এ কাজ সম্ভবপর হয়েছিল। এ সব দেশের নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসক কর্তৃপক্ষের মানসিক দাসত্ব ও ইউরাপের অন্ধ অনুসরণ প্রিয়তাই ছিল এর প্রকৃত ও মূলীভূত কারণ। মিশর ও তুর্কির নাম এ পর্যায়ে উল্লেখ্য।

মিশরে ইউরোপীয় আইন প্রবর্তিত হয় খেদিব ইসমাইলের শাসনামলে, এটা ঐতিহাসিক সত্য। মূলত তিনি মিশরে শরীয়াত ও বিভিন্ন ইসলামী মাযহাব থেকে গৃহীত আইন-বিধান প্রবর্তন করতেই চেয়েছিলেন। এ জন্য জামে আজহারের মনীষীদের নিকট এ ধরনের একটি আইন গ্রন্থ প্রণয়ন করার দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আর তার মূল কারণও ছিল বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ, হিংসা ও বিদ্বেষ। এ বিরাট ও মহান কাজে তাঁরা পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হলেন না। এবং এরই ফলে একটি ইসলামী দেশে ইসলামী আইন-বিধান প্রবর্তনের শেষ সুযোগও চিরতরে হারিয়ে ফেললেন। অবশ্য এ জন্য তাঁদের বহুদিন কাঁদতে হয়েছে এবং সারা জীবন ভরে কাঁদলেও বোধ হয় এ অপরাধ ও অক্ষমতার কোন প্রতিকার হতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেক কয়টি মুসলিম দেশই এমন ছিল, যেখানে ইউরাপীয় আইন প্রণয়ন করা হলেও তা ইসলামী শরীয়াতের বিরুদ্ধতা করার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়নি। সেসব দেশের নেতৃবৃন্দ ও শাসক মণ্ডলী যদিও শরীয়াতের বিরুদ্ধতা করার কথা চিন্তাও করেননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও শরীয়াত বিরোধী আইন-বিধান এসব দেশে প্রবর্তিত হয়েছে। তা হয়েছে হয় এ কারণে যে, এ সব আইনের প্রণেতারাই ছিল ইউরোপীয় লোক, শরীয়াতের সাথে তাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না, নতুবা তারা এমন মুসলমান ছিল, যারা মানব রচিত আইন সম্পর্কে অবহিত

www.bjilibrary.com

শরীয়াত সম্পর্কে কিছুই জানত না। আর এ অজ্ঞতার কারণে ইউরোপীয় আইনে ইসলামী শরীয়াতের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা করা হয়েছে।

শরীয়াতের উপর আইনের প্রভাব

মুসলিম দেশসমূহে ইউরোপীয় আইন জারি হওয়ার ফলে সে সব দেশের অবস্থার সাথে তার খাপ খাওয়ানো ও সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে বিশেষ জটিলতার উদ্ভব হয়েছে। এ জন্য ইউরোপীয় বিচারক মণ্ডলী নিয়োগ করতে হয়েছে। কিংবা এমন সব দেশী বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে যারা এ সব আইন শিখেছেন ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন বটে, কিন্তু ইসলামী আইন আদৌ পাঠ করেননি। এ সব দেশের বিচার বিভাগগুলো সব ব্যাপারে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। এর ফলে এ সব দেশে ইসলামী শরীয়াত কার্যত অকার্যকর ও বেকার হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। কেননা, নতুন বিচার বিভাগগুলো ইউরোপীয় আইন ছাড়া অন্য কিছু জারি করতে আদৌ রাজী হয়নি।

এভাবেই এ সব দেশে নতুন আইন অধ্যয়নের জন্য নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন আইন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করল। আর ওয়াক্ফ ইত্যাদি কয়েকটি সামান্য ক্ষেত্র ছাড়া জীবনের আর সব ক্ষেত্র থেকেই ইসলামী আইন উৎখাত হয়ে গেল। আইনবিদ বলে পরিচিত লোকেরা কেবল ইউরোপীয় আইনই জানতেন শরীয়াতী আইন সম্পর্কে তাঁরা একেবারে অজ্ঞ থেকে গেলেন। অথচ শরীয়াত এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা পেশ করেছিল যার ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ অতি সহজে গড়ে উঠতে ও সর্বাধুনিক মান অনুযায়ী চলতে পারত।

ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে আইনবিদদের এই অজ্ঞতা এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করল। তাঁরা শরীয়াতের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে তার এমন ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন যাতে করে তা বাস্তব ক্ষেত্রে মানব রচিত আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কোন কোন দিক দিয়ে তা কার্যত শরীয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মিশরে প্রবর্তিত দণ্ড বিধানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ দণ্ড বিধানের ধারাসমূহ জনগণের এমন সব ব্যক্তিগত অধিকারের সহিত সম্পৃক্ত, যা ইসলামী শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

কিন্তু চালু আইনের মিশরীয় ব্যাখ্যাতারা শরীয়াত নির্ধারিত সেসব অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নহেন, তারা বরং ফরাসী আইনের স্বীকৃত অধিকারসমূহই জানেন—ফরাসী ব্যাখ্যাতাদের পদ্ধতিতে, সে কারণে তারা শরীয়াত স্বীকৃত মানবাধিকারকে কার্যত অস্বীকার করে বসেছেন।

মোটকথা মিশরে প্রবর্তিত আইনের ব্যাখ্যাতারা এ কাজ করেছেন দু'টি বাস্তব কারণে ঃ

একটি হল, তারা ইমলামী শরীয়াত মোটেই পাঠ করেননি, এ কারণে তার আইন-বিধান ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কিছুই জানেন না।

আর দ্বিতীয় হল, সব ব্যাপারে তাঁদের নিজস্ব মত রয়েছে। আর এ মত সাধারণভাবে ইউরোপীয় ব্যাখ্যাতাদের আর বিশেষভাবে ফরাসী ব্যাখ্যাতাদের মনোভাবে প্রভাবিত হয়ে গড়ে উঠেছে। ফলে এরা যা কিছু হালাল করেছেন তাই হালাল এবং যা কিছু হারাম করেছেন তাই হারাম মনে করেন। অথচ এসব ইউরোপীয় আইন-ব্যাখ্যাতারা ইসলামী শরীয়াতের প্রকৃতি সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ।

বস্তুত মানব রচিত আইনসমূহ যখন ইসলামী শরীয়াতের বিধানসমূহকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ও তাকে সম্পূর্ণ অকেজো করে রেখেছে তখন অবশ্যই মনে করতে হবে যে, নীতিগতভাবেও এ আইনসমূহ শরীয়াতের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে বা তাকে অকেজো প্রমাণ করতে পারেনি। ফলে শরীয়াতের বিধান অবিকৃত ও স্থায়ী হয়েই রয়ে গেছে এবং সর্বাবস্থায় তাই প্রয়োগ করা আবশ্যক। এটা শরীয়াতেরই নির্দেশ, আইনের ধর্মই তাই। কেননা, শরীয়াত ও মানবীয় আইন-উভয়েরই নিয়ম হল, কোন আইন অনুরূপ শক্তি সম্পন্ন কিংবা ততোধিক শক্তি সম্পন্ন অপর আইন ছাড়া আর কেউ বাতিল করতে পারে না। অর্থাৎ মূল আইন দাতা কিংবা আইন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত আইনকে তার অপেক্ষা কম মর্যাদা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত আইন বাতিল করতে পারে না।

কাজেই শরীয়াতের কোন আইনকে বাতিল করতে পারে কেবল কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত আইনই, অন্য কিছু নয়। অতএব আমাদের নিকট যে কুরআন ও সুন্নাহ রয়েছে তা কোন ক্রমেই বাতিল বলে বিবেচিত হতে পারে না।

www.bjilibrary.com

কেননা, রাসূলে করীমের (সা) অন্তর্ধানের পর অহী নাযিল হওয়া চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। অতপর নতুন কোন সুন্নাতও আবির্ভূত হতে পারে না। উপরন্তু আমাদের গঠিত কোন মানবীয় আইন পরিষদ প্রদত্ত আইনও কুরআন ও সুন্নাহর সমমর্যাদার অধিকারী হতে পারে না। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আইন প্রদানের যে অধিকার রয়েছে, তা আর কারুরই থাকতে পারে না। সেই সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আমাদের জাতীয় নেতাদেরও প্রকৃত পক্ষে আইন রচনার কোন অধিকারই নেই, তাদের অধিকার রয়েছে আইন জারি করার, আইনের ভিত্তিতে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ করার। আইন প্রণয়ন তো নিরংকুশভাবে আল্লাহ ও রাসূলের অধিকার আর রাসূলের অন্তর্ধানের সাথে সাথে তার সব সুযোগই চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। অহী বন্ধ হওয়ার ফলে আইনের উৎসও নিশেষ হয়ে গেছে। অতপর নতুন কোন আইন-বিধান আসতে পারে না, পাওয়া যেতে পারে না নতুন কোন আইন বিধানের উৎসে।

মানবীয় আইন ও শরীয়াতের মাঝে বিরোধ

মানব রচিত আইন ও শরীয়াতের মধ্যে যদি বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে শরীয়াতের আইনই কার্যকর হবে, মানবীয় আইন নয়। তার মূলে তিনটি কারণ রয়েছে ঃ

প্রথমত ইসলামী শরীয়াতের আইন চিরন্তন ও শাশ্বত। কোন অবস্থায়ই তা প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইনই প্রত্যাহার করা যেতে পারে। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মানব রচিত আইনের তুলনায় শরীয়াতের আইন অধিক বলিষ্ঠ ও স্থিতিশীল।

দ্বিতীয়ত শরীয়াত তো তার পরিপন্থী সব কিছুকেই বাতিল করে দেয় এবং তার অনুসরণ করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। পূর্বে এ কথার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কাজেই শরীয়াত বিরোধী যে কোন আইনকেই বাতিল ধরে নিতে হবে এবং তাতে কোনরূপ শর্তের অবকাশ থাকতে পারে না।

এবং তৃতীয়ত এই যে, শরীয়াতের বিপরীত আইন স্বতই তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। আর যে আইন তার কার্যকারিতা হারায় তা গ্রহণ করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। আপনিই তা বাতিল হয়ে যাবে। খোদ মানব রচিত আইনেরই ধর্ম এই।

www.bjilibrary.com

শরীয়াত বিরোধী আইন কিভাবে কার্যকারিতা হারায়

মানব রচিত আইন রচিত হয় সমাজের প্রয়োজন পূরণ, সমাজ সংগঠন, তার আইন-শৃংখলার সহায়তা ও সমাজ-ব্যক্তিদের মাঝে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে। আর সমাজের লোকদের আকীদা-বিশ্বাস, আইন-শৃংখলা ও সভ্যতা-কৃষ্টি রক্ষা করাই হল সমাজের সবচাইতে বড় প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্রে সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয় ইসলামী আদর্শ ও আইনের ওপর, অধিকাংশ লোকের মনে ইসলামী আকীদাই স্থান লাভ করে থাকে। কাজেই সেখানকার যাবতীয় আইন শরীয়াত মুতাবিক হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে তা হয় না, আইন হয় শরীয়াতের পরিপন্থী, সেখানে সে আইন অবশ্যই বাতিল হবে, বাতিল হবে কেবল শরীয়াতের দৃষ্টিতেই নয়, সাধারণ আইনের দৃষ্টিতেও এ নীতি।

আমরা যখন ইসলামের তত্ত্ব জানতে পারি, জানতে পারি তার আইন কানুন, তখন ইউরোপে সমাজের কল্যাণ সাধন ও ব্যক্তিদের মাঝে শান্তি-শৃংখলা বহাল করার উদ্দেশ্যে কিভাবে আইন তৈরী হয়, তাও জানতে সক্ষম হই। আর সে আইন যখন ইসলামী সমাজে প্রবর্তন করা হয়, তখন তা সমাজকে কষ্টদান, তাদের আদর্শ ও সংস্কৃতি বিনষ্টকরণ ও তাদের দিলকে উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে এবং তা সমাজের অধিকাংশ লোকের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তার ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই সমাজে বিশৃংখলা ও অশান্তি দেখা দেয়।

(১) অতএব ইসলাম আল্লাহর শরীয়াত বিরোধী কোন আইন গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য বরদাশত করে না। আর যে আইন শরীয়াতের পরিপন্থী, শরীয়াতের সাধারণ নিয়মের বিপরীত কিংবা শরীয়াতের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও ভাবধারার পক্ষে মারাত্মক, তা মেনে নেয়া মুসলমানের জন্য চিরকালের তরে হারাম। কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণায়ই তা হারাম প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য দু'টি পথই খোলা রেখেছেন ঃ হয় তারা আল্লাহ ও রাসূলের আহবান কবুল করবে, আনুগত্য স্বীকার করবে, মেনে নিবে রাসূলের উপস্থাপিত বিধান, না হয় নিজেদের নফসের খাহেশকে মেনে চলবে। এর মাঝে তৃতীয় কোন পথই খোলা রাখা হয়নি। আর রাসূল (সা) যে বিধান

পেশ করেননি, তা মেনে নেয়াই হল নফসের খাহেশকে মেনে নেয়া। কুরআন মজীদে এ কথাই বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ (القصص : ٥٠)

"হে নবী, এ লোকেরা যদি তোমার আহবান কবুল না করে তাহলে জানবে যে, তারা নিজেদের মনের খাহেশকেই মেনে চলছে, যার পিছনে আল্লাহর দেয়া হেদায়াতের কোন সমর্থন নেই। —(আল-কাসাস ঃ ৫০)

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

(الجاثية : ١٨ - ١٩)

"হে নবী, অতপর তোমাকে প্রত্যেকটি ব্যাপারে শরীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি, অতএব তুমি তা অনুসরণ করে চলবে এবং সেসব লোকদের খামখেয়ালীকে মেনে চলবে না যারা কিছুই জানে না। কেননা, তারা তোমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে এক বিন্দু বাঁচাতে পারবে না। অবশ্য জালেম লোকেরা পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক, আর আল্লাহ হচ্ছেন মুত্তাকী লোকদের পৃষ্ঠপোষক।" —(আল-জাসিয়া ঃ ১৮-১৯)

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○ (الاعراف : ٣)

"তোমাদের নিকট তোমাদের রবের নিকট থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তোমরা তাই মেনে চল, তাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তো খুব সামান্যই নছীহত কবুল করে থাক।" —(আল-আরাফ ঃ ৩)

(২) আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান মু'মিন লোকেরা মেনে চললে আল্লাহ তাতে একবিন্দু রাজী হতে পারেন না। আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অপর কোন আইনের বিচার চাওয়াও আল্লাহর পসন্দনীয় কাজ নয়। বরং আল্লাহ তো তাঁর বিধানের বিপরীত সব বিধানকেই অমান্য করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানের প্রতি এক বিন্দু সন্তোষ প্রকাশ করাকেও চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, তাতে করে তো শয়তানেরই পায়রুবী করা হয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلاً بَعِيْدًا ۝ (النساء : ٦٠)

"তুমি কি লক্ষ্য করনি সে লোকদের স্বভাব, যারা মনে করে যে, তারা ঈমান এনেছে যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে, যা নাযিল হয়েছে তোমার পূর্বে—তার প্রতি, তারা আল্লাহদ্রোহী শক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট বিচার পাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছে। অথচ তাকে অস্বীকার করারই নির্দেশ তাদের দেয়া হয়েছিল। আর শয়তান তো তাদের গোমরাহ করে অনেক দূরে নিয়ে যেতে চাইছে।" –(আন–নেসা ঃ ৬০)

অতএব যে লোক আল্লাহর বিধান ও রাসূলের উপস্থাপিত আইন ছাড়া অন্য যে কোন বিধানের নিকট বিচার চাইবে, সে 'তাগুতের' নিকট বিচার চাইল, সে তাগুতকে 'বিচারক' বলে মেনে নিল। আর 'তাগুত' হচ্ছে এমন প্রত্যেকটি জিনিস বা প্রতিষ্ঠান যাকে মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিচারক বা আইন দাতা বলে মেনে নেয়, অবশ্য অনুসরণীয় বলে স্বীকার করে। অতএব আল্লাহ ও রাসূলের পরিবর্তে অন্য যে কারুর নিকটই বিচার চাওয়া হবে—আল্লাহকে বাদ দিয়ে তা ইবাদাত করুক কিংবা তার অনুসরণই করুক সে–ই 'তাগুত'। তা বুঝে করুক, আর না বুঝেই করুক, তাতে কোন পার্থক্য হয় না। কাজেই যে লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, সে অন্য কারুর প্রতি ঈমান আনতে পারে না, আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কারুর বিধান মেনে নিতেও পারে না।

(৩) মু'মিন স্ত্রী বা পুরুষ নিজের জন্য এমন কোন পন্থা মেনে নিবে, যা আল্লাহ এবং রাসূল পসন্দ করেন না, আল্লাহ তার কোন অবকাশই রাখেননি। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۚ (الاحزاب - ٣٦)

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন কোন ফায়সালা করে দেন, তখন তা গ্রহণ করা না-করার কোন ইখতিয়ারই কোন মু'মিন স্ত্রী-পুরুষের থাকতে পারে না।" —(আল-আহযাব ঃ ৩৫)

(৪) আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন যে, সব আইন ও বিচার কার্য আল্লাহর বিধান মতই সম্পন্ন হতে হবে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তাদেরকে আল্লাহ কাফের, যালেম ও ফাসেক বলে অভিহিত করেছেন।

বলেছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

"আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারা কাফের।" —(মায়েদা ঃ ৪৪)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ○

"আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারা জালেম।" —(মায়েদা ঃ ৪৫)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ○

"যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না, তারা ফাসেক।"—(মায়েদা ঃ ৪৭)

তাফসীরকার ও ফিকাহবিদরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, যে মুসলমান আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান রচনা বা গ্রহণ করবে এবং

www.bjilibrary.com

তার ফলে আল্লাহর বিধানকে সম্পূর্ণত কিংবা আংশিক পরিত্যাগ করবে, তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, তার সম্পর্কেই আল্লাহর উপরোক্ত কথা সত্য হয়ে যাবে। যেমন কেউ যদি যেনা–ব্যভিচার, মিথ্যা কলংক আরোপ কিংবা চুরির কুরআন প্রদত্ত দণ্ডকে অমান্য করে বা বাদ দিয়ে চলে, সে সুস্পষ্ট কাফের। যদি কেউ অন্য কোন কারণে তা করে—কুরআনের আইনকে অস্বীকার বা অপসন্দ নাও করে তবু সে যালেম, কেননা, তার এ কাজে অধিকার বিনষ্ট বা ক্ষুণ্ন হয়। অথবা তার এ কাজের ফলে সুবিচার ও সাম্য ব্যাহত হয়। অন্যথায় সে ফাসেক হবে। অনধিকার চর্চা করেছে, যে কাজ করার তার অধিকার ছিল না, সে তা করেছে এবং তার কর্মসীমা বহির্ভূত কাজ করে মীমাংসা করার অপরাধ করেছে।

(৫) মানুষের পারস্পরিক ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসা করার জন্য রাসূলে করীম (সা)–কে একমাত্র মীমাংসাকারী রূপে মানতে হবে। তিনি যা কিছু ফায়সালা করে দেবেন, তা অকুণ্ঠ চিত্তেই মেনে নিতে হবে, তাঁর ফায়সালার সামনে মাথা নত করে দিতে হবে এ কথাই কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

"নয়, কিছুতেই নয়, তোমার রবের নামে শপথ করে বলছি, এ লোকেরা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না। যতক্ষণ না তারা—হে নবী, তোমাকে তাদের নিজেদের পারস্পরিক ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী রূপে মেনে নিবে। (শুধু তাই নয়) তুমি যা ফায়সালা করে দেবে তা মানার ব্যাপারে তাদের মনে কোনরূপ কুণ্ঠা থাকতে পারবে না, বরং তারা তা পুরাপুরিভাবেই মেনে নিবে।'"—(নিসা ঃ ৬৫)

(৬) শরীয়াতের যা কিছু বিপরীত বা বিরোধী, মুসলমানদের জন্যে তা সম্পূর্ণ হারাম। রাষ্ট্র বা প্রশাসন শক্তি যদি সে কাজ করার নির্দেশ দেয় কিংবা তাকে বৈধ বা মুবাহ বলে ঘোষণাও করে, তবু তা কখনই এবং কিছুতেই হালাল হয়ে যাবে না। কিন্তু কেন? তার কারণ এই যে, প্রশাসন শক্তির আইন

রচনা করার সমস্ত ইখতিয়ার সীমাবদ্ধ হচ্ছে এ শর্তের মধ্যে যে, তা অবশ্যই শরীয়াতের অনুকূল ও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অতপর কোন প্রশাসন শক্তি যদি এ সীমালংঘন করতে এবং কোন হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করার ইচ্ছা করে তবে তা মেনে নেয়া যেতে পারে না। কেননা, এরূপ করার তার কোন ইখতিয়ারই থাকতে পারে না। আর কেউ যদি সেরূপ কোন কাজ করেও তবু কোন মুসলমানেরই তা মেনে নেয়ার অধিকার নেই। বরং এই ধরনের সব আইন লংঘন করা স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করা এবং তাকে জারি হতে না দেয়াই প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র-কর্তাদের আনুগত্য করার অনুমতি নিরংকুশ ও শর্তহীনভাবে দেয়া হয়নি। তা করা কর্তব্য কেবল তখনি যখন আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে তা করা হবে। কুরআন মজীদ এ কথাই বলেছে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

(النساء : ٥٩)

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, অনুসরণ কর রাসূলের এবং রাষ্ট্র-কর্তাদেরও। কোন বিষয়ে তোমরা যদি পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে সে বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসার ভার আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর অর্পণ কর।" —(আন-নেসা ঃ ৫৯)

আল্লাহ ও রাসূল ছাড়া অন্যদের আনুগত্য করার সীমা ও নিয়ম-কানুন হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق

"কারুর আনুগত্য করলে যদি মহান সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী হয়ে যায়, তাহলে তা কিছুতেই করা যাবে না।"

বলা হয়েছে ঃ

www.bjilibrary.com

انما الطاعة في المعروف

"আনুগত্য করা যাবে কেবলমাত্র ন্যায়সংগত ও শরীয়াত সম্মত ব্যাপারাদিতে—অন্য ক্ষেত্রে নয়।"

রাষ্ট্রকর্তা ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

من امركم منهم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة

"তাদের কেউ যদি কোন নাফরমানী বা গুনাহের কাজ করার নির্দেশ দেয়, তাহলে তা শোনাও যাবে না। এবং তা মানাও যাবে না।"

রাসূলের সাহাবী, ফিকাহবিদ ও মুজতাহিদগণ একমত হয়ে বলেছেন যে, রাষ্ট্রনায়কদের আনুগত্য করা যেতে পারে কেবলমাত্র সেসব ক্ষেত্রে, যেখানে তা করলে একই সাথে আল্লাহরও আনুগত্য হয়ে যায়। যেসব কাজে সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী হয় সেসব কাজ করা যে, একেবারেই জায়েয নয় এ ব্যাপারে কারুরই একবিন্দু দ্বিমত নেই। যেনা-ব্যভিচার, মাদকদ্রব্য পান, আল্লাহর দেয়া দণ্ড বিধানকে বাতিল করা, শরীয়াতের আইনকে অকেজো করে রাখা এবং আল্লাহ অনুমতি দেননি এমন আইন রচনা করা—প্রভৃতি কাজ সুস্পষ্ট কুফরি। যারা তা করে তারা ইসলাম ত্যাগ করে মুর্তাদ হয়ে গেছে,-কাফের হয়ে গেছে মনে করতে হবে। কোন মুসলিম নামধারী শাসক যদি মুর্তাদ হয়ে যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। অন্তত তাকে যে, অমান্য করতে হবে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

(৭) শরীয়াতের বিধান ও পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুনকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড-বিখণ্ড করা যেতে পারে না এবং এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করাও সম্ভব নয়। কাজেই শরীয়াতের কতিপয় আইন বাস্তবায়িত করা এবং অপর কিছু আইনকে অকেজো করে রাখা কোন মুসলমানের পক্ষেই জায়েয হতে পারে না। ইতিপূর্বে আমরা এ পর্যায়ে অনেক কথা বলেছি এবং এর পক্ষে অনেক যুক্তিও আমরা পেশ করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয়।

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তা সবই ইসলামের মৌল সত্যেরই কয়েকটি কথা মাত্র। আর এ সবই হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর ঘোষিত আদর্শ।

www.bjilibrary.com

ইসলাম-অভিজ্ঞ ও ইসলামের প্রতি ঈমানদার লোকদের পক্ষে এ সব কথাই অতীব বাস্তব।

প্রত্যেক মুসলিমেরই এ আদর্শের অনুসারী হওয়া আবশ্যক এবং তদনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেকেরেই কর্তব্য। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইনসমূহ মূলতই প্রচলিত আকীদা-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান অনুরূপই গড়ে উঠেছে। এই কারণেই তা ইসলামী শরীয়াতের পরিপন্থী, সীমালংঘনকারী ও তার সাথে সাংঘর্ষিক। এসব আইন জনগণকে ইসলামী আদর্শের প্রতি অবিশ্বাসী বানিয়ে দেয়, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। আর ইসলাম এটাকেই কঠিনভাবে ঘৃণা করে।

পূর্বোল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, মানব-রচিত আইন ইসলামী দেশসমূহে প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এ দেশসমূহ নিজেদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, জনমনকে অত্যন্ত বিষাক্ত করেও তুলেছে। এসব আইন সমাজের সর্বস্তরে চরম বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম জনগণের জীবন ও সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে শরীয়াত সম্পর্কে জ্ঞান ও অবহিতির মাত্রার পার্থক্য রয়েছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। এ কারণে শরীয়াত সম্পর্কিত জ্ঞান ও অবহিতির দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, মুসলমানদের মধ্যে কয়েক শ্রেণীর লোক রয়েছে। এক শ্রেণীর লোক অসংস্কৃতি সম্পন্ন, দ্বিতীয় এক শ্রেণীর লোক ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারক, আর তৃতীয় এক শ্রেণীর লোক হল ইসলামী সংস্কৃতি সম্পন্ন।

এখানে আমরা এ তিন শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে আলোচনা করছি।

(১) অসংস্কৃতিবান লোক

এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শামিল রয়েছে যতসব উম্মী ও অশিক্ষিত লোকেরা। এদের সংস্কৃতি অতি স্থূল ধরনের, এদের এমন কোন বোধশক্তিই নেই, যার দ্বারা তারা সমুখবর্তী সব ব্যাপারে ভাল করে বুঝতে পারে ও বুঝে শুনে কাজ করতে পারে এবং সে ব্যাপারে সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ সব লোক ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে কিছুই জানে না। আর জানলেও তা জানে মাত্র কতিপয় ইবাদাতের অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে স্থূলভাবে। কোন গভীর জ্ঞানের অধিকারী এরা নয়। এরা যেসব ইবাদাত-বন্দেগী করে তা প্রধানত অভ্যাস বশতই করে এবং করে তাদের বাপ-দাদা, ভাই ও মুরব্বীদের অন্ধ অনুসরণ হিসেবে। এদের মাঝে এমন কাউকে পাবে না, যে স্বীয় অধ্যয়ন ও অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে ইবাদাত বন্দেগী করছে বলে মনে করা যেতে পারে।

অধিকাংশ মুসলমানই এ পর্যায়ে গণ্য। সারা মুসলিম জাহানের সমস্ত মুসলমানের মধ্যে শতকরা প্রায় আশিজনই হবে এ ধরনের লোক। আর এরা সমসাময়িক সংস্কৃতিবান লোকদের দ্বারা খুবই প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে—সে

www.bjilibrary.com

সংস্কৃতিবান লোক ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারক হোক, কি ইসলামী সংস্কৃতির ধারক। কিন্তু সেই সাথে এ কথাও সত্য যে, তারা প্রধানত ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী সংস্কৃতি দ্বারাই অধিক প্রভাবিত হয়ে থাকে। কেননা, তারা অন্যান্য বিষয়াদির তুলনায় ইসলামী বিষয়াদি বুঝতে অধিক সক্ষম। শিক্ষিত লোকেরা যদি তাদেরকে ইসলামী ভাবধারায় সঞ্জীবিত করে না তুলে, তাহলে এটা হবে একটা জাতীয় অপরাধ। আর এ সুযোগে তারা উরোপীয় সংস্কৃতিবানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে, এটা একটা দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

অথচ ইসলাম-অভিজ্ঞ লোকদের পক্ষে এই শ্রেণীর লোকদের ইসলামের পথে নিয়ে আসা ছিল অতীব সহজ কাজ, তাঁরাই এদেরকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করতে পারতেন। এ জন্যে বিশেষ কর্মতৎপরতার প্রয়োজন ছিল। তাদের এ কথা বুঝানোর দরকার ছিল যে, জীবনের প্রতিটি ব্যাপারের সাথেই ইসলাম জড়িত এবং জীবনের সমস্ত কিছুই শরীয়াতের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা না হলে তাদের ঈমান পুর্ণত্ব লাভ করতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রায় দেশেরই আলেম সমাজ এ দায়িত্ব পালনে বিমুখ হয়ে রয়েছেন। আর এর পরিণাম হলো এই যে, বিপুল সংখ্যক মুসলমান ইসলামের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে গেল। এরা মনে করে যে, তাদের পথই আলোকোজ্জ্বল, আর ইসলামপন্থীরা সব বিভ্রান্ত। আর এ যুগেও ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করাই নাকি (তাদের মতে) সব চাইতে বড় গোমরাহী। অথচ ইসলামের আলেমরা তাদেরকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসতে আদৌ চেষ্টা করছেন না।

(২) ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত লোক

মুসলিম জাহানে বর্তমানে এ পর্যায়ের লোক বোধ হয় সংখ্যার দিক দিয়ে সর্বাধিক। ইউরোপীয় সংস্কৃতির তারা শুধু ধারকই নয়, তারা এক বড় প্রচার মাধ্যমও। এক কথায়, এদের মাধ্যমেই এসব দেশে ইউরোপীয় সংস্কৃতির শিকড় গেড়ে বসেছে। এরা এর বড় প্রবক্তাও। এদের মধ্যে আবার অনেকে উচ্চমানের সংস্কৃতির ধারক হয়ে বসেছে। এসব দেশের বিচারপতি, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক-অধ্যাপক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং গোটা রাজনীতি এ সাংস্কৃতিক ভাবধারায়ই উজ্জীবিত।

www.bjilibrary.com

এ শ্রেণীর লোকেরা ইউরোপীয় পন্থা ও পদ্ধতিতেই সংস্কৃতিবান হয়ে উঠেছে। আর এ কারণে তারা ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে কিছুই জানে না। অবশ্য মুসলিম হওয়ার কারণেই অভ্যাস পরিবেশের কারণে শরীয়াতেরও অনেক কিছু হয়ত এদের জানাও হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা গ্রীক ও রোমান পদ্ধতির ইবাদাত-বন্দেগীর সহিতই বেশী পরিচিত। ইউরোপীয় আইন-কানুন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যেই এদের জ্ঞান-গরিমা সীমাবদ্ধ। তুলনামূলকভাবে এরা ইসলাম ও তার শরীয়াত সম্পর্কে খুব কমই জানে।

সেই সাথে এ কথাও স্বীকৃতব্য যে, এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে খুবই অল্প সংখ্যক লোক এমনও রয়েছে, যারা নিজস্ব বিশেষ অধ্যয়নের মাধ্যমে শরীয়াতের কোন কোন খুঁটিনাটি বিষয়ে ওয়াকিফহাল হয়েছেন। কিন্তু তার পরিধিও খুব বিস্তৃত নয়। সম্ভবত তা খুবই স্থূল ও অগভীর। এ কথা অনস্বীকার্য যে, শরীয়াতের মৌল ভাবধারা ও গভীর তাৎপর্য এবং তার ভিত্তি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী একজন লোকও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

এরাই হচ্ছেন ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারক ও প্রবক্তা। আর এরা ইসলামী শরীয়াতকে চরমভাবে ভুলে বসে আছেন এবং তা উপেক্ষাই করে চলছেন। আর বড়ই দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর লোকেরাই বর্তমান মুসলিম জাহানের উপর নেতৃত্ব কায়েম করে বসেছেন। বলতে গেলে মুসলিম জাহানভুক্ত প্রায় সব কয়টি দেশের শাসন-কর্তৃত্ব এ শ্রেণীর লোকেরাই দখল করে রয়েছেন. আর তারাই বিশ্ব-রাষ্ট্রসমূহের সম্মুখে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছেন, করছেন খুবই লজ্জাকরভাবে।

অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে, এদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছেন, যারা শরীয়াতকে না জেনেও দীন ইসলাম মোটামুটি পালন করছেন। তাঁদের পাকা ঈমানও রয়েছে, আর যতটুকু তাঁরা জানেন, ততটুকু পরিমাণে তাঁরা ইবাদাত-বন্দেগীও করছেন। যা তাঁরা জানেন না, তা তারা জানতে চেষ্টা করহেন, কিন্তু তাই বলে শরীয়াত সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কেননা, এ কাজ খুব সহজসাধ্য নয়। এ জন্যে দীর্ঘদিন ধরে গভীর ও ব্যাপক পড়াশুনা করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তা করা এদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। বিশেষ করে এ জন্যে যে, ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাদি হাজার বছর পূর্বের পদ্ধতিতে লিখিত এবং তা

www.bjilibrary.com

আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিভক্তও নয়। ফলে তা থেকে খুব সহজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত লাভ করা সহজ হচ্ছে না। আর বিশেষ একটি বিষয়ে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পক্ষে তা থেকে খুব সহজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত লাভ করা সহজ হচ্ছে না। আর বিশেষ একটি বিষয়ে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পক্ষে তা থেকে সে বিষয়ে জেনে নেয়া সম্ভবপরও হচ্ছে না। কেননা, সে জন্যে বহু পৃষ্ঠা উল্টাতে হয় ও আদ্যোপান্ত পাঠ করতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, শুল্ক সম্পর্কে একটি মাসয়ালা জানতে হলে মোটামোটি কিতাবের বহু পৃষ্ঠা খুঁজে দেখতে হবে, তারপরই হয়ত তা এমন এক স্থানে পাওয়া যাবে, যেখানে তা পাওয়ার হয়ত কোনই আশা করা যায়নি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাকে নিরাশও হতে হয়। বিশেষত শরীয়াতের সেকালে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ জানা ও বোঝা না থাকার দরুন প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ধারে ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়। আমি এমন অনেক লোককেই জানি, যাঁরা শরীয়াতের কোন সিদ্ধান্ত জানবার জন্যে বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তাদের মনোযোগ বিনষ্ট হয়েছে এবং এসব কিতাবের মূল ভাষ্য ও টিকার মধ্যে তাঁদের সংকল্পকে হারিয়ে ফেলতে হয়েছে। কিন্তু তারা যদি অতি আধুনিক পদ্ধতিতে লিখিত শরীয়াতের কিতাব পেতেন, তাহলে তাঁরা তা পড়তেও পারতেন, তা থেকে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করে উপকৃত হতে ও অন্যদের উপকৃত করতেও পারতেন।

ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত এ শ্রেণীর লোকেরা ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে নানা রকম আশ্চর্যজনক—বরং হাস্যোদ্দীপক দাবী উত্থাপন করছেন। কেউ কেউ দাবী করছেন, আইন ও রাষ্ট্র শাসন—তথা রাজনীতির সাথে ইসলামী শরীয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। কেউ আবার ইসলামকে একটা দ্বীন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থারূপেও দেখছেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা মনে করেন যে, এ কালের বৈষয়িক ব্যাপারাদির ক্ষেত্রে শরীয়াত একেবারেই অচল, অযোগ্য। কেউ কেউ আবার মনে করেন, শরীয়াত বর্তমানকালেও চলার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তার কতক বিধান একান্তভাবে সেকেলে—এ যুগে চলতে পারে না। কিন্তু এমন লোকও আছেন যাদের বিশ্বাস, শরীয়াত একালেও চলার যোগ্য, তার আইন বিধান চিরন্তন ও শাশ্বত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অনেকগুলো বিধানই একালের বৈদেশিক চাপের দরুন কার্যকর হতে পারে না। অনেকে

www.bjilibrary.com

আবার এ দাবীও করে থাকেন যে, ইসলামী ফিকাহ কুরআন-সুন্নাহ থেকে যতটা না গৃহীত, ফিকাহবিদদের নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে রচিত তার অনেক বেশী।

তাঁদের পেশ করা দাবীসমূহ এ ধরনেরই। কিন্তু এগুলো একেবারেই মূল্যহীন দাবী। কেননা, এ দাবীসমূহ পেশ করছেন এমন সব লোক যাঁরা ইসলামী শরীয়াতকে মাত্রই জানেন না। আর যে বিষয়ে যে লোক অজ্ঞ সে বিষয়ে তার কোন মত কিছু মাত্র গুরুত্ব পেতে পারে না। সেগুলো তো অর্থহীন দাবী ও ভিত্তিহীন মতামত মাত্র।

আসলে এ ধরনের মত ও দাবীর মূলে দু'টি কার্যকারণ রয়েছে। একটি হচ্ছে শরীয়াত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা আর দ্বিতীয় হচ্ছে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে তাদের গভীরভাবে প্রভাবিত হওয়া। সেই সাথে আধুনিক আইন বিধান সম্পর্কে তাদের জ্ঞানকে শরীয়াতের সাথে এক বিন্দু খাপ খাওয়াতে না পারা। আর এ শ্রেণীর লোকদের মতামত ও দাবী-দাওয়া পরস্পর বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। তা পরস্পর খণ্ডিত ও রহিত। একজনের কথার প্রতিবাদ তাদেরই অপর একজন করে দিচ্ছে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এর এক একটি দাবীর উল্লেখ করে তার বাতুলতা প্রমাণ করতে চেষ্টিত হব।

প্রথম, ইসলামের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক নেই

ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত লোকদের কেউ কেউ দাবী করছে যে, ইসলাম একটা ধর্ম মাত্র।[১] আর ধর্মের সম্পর্ক মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যবর্তী

---

১. কেবল ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত লোকদের কথাই নয়, এ দেশের এক শ্রেণীর মৌলভী ও বিদয়াতী পীর বলে বেড়ায়, ইসলাম একটা ধর্মমাত্র এবং এর সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। এ বলে তারা শরীয়াত কায়েম করার ফরযিয়াতকে অস্বীকার করতে চাইছে। শুধু তাই নয়, এরা বিশ্বনবী হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর সীরাত আলোচনার জন্যে যে কনফারেন্স আহবান করে, তাকে সর্বপ্রকার রাজনীতিমুক্ত একটি খালেস ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে রাসূলে করীমের রাষ্ট্রীয় জীবন এবং রাষ্ট্র, রাজনীতি ও আইন-কানুন সম্পর্কে আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদের ঘোষণাবলীকেও বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখাবার ধৃষ্টতা দেখায়। এদের স্থান যে কোথায় আল্লাহই জানেন। (অনুবাদক)

ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজনীতি ও রাষ্ট্র শাসনের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাদের প্রতি আমাদের প্রথম প্রশ্ন এ মত কি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত? তারা এর কোন জওয়াব দিতে পারেনি। কেননা, এ কথার মূলে কোন সনদ নেই। এ শুধু ইউরোপীয় সংস্কৃতির উদ্ভাবিত মনোভাবের ফসল। আর ইউরোপীয় সংস্কৃতি যে ধর্ম ও রাজনীতি—তথা গীর্জা ও রাষ্ট্রের মাঝে গভীর পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছে, এ কথা তো সর্বজনবিদিত। এ পার্থক্য ও বিচ্ছেদকরণের উপরই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। এরা এখান থেকেই এ কথাটি শিখেছে এবং তা সব দেশে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাচ্ছে। কিন্তু তারা যদি এতটুকু বুঝত যে, ইউরোপীয় সংস্কৃতির কোন কথাই এ ব্যাপারে প্রমাণ বা যুক্তি হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে যদি কোন দলীল পেশই করতে হয় তা হলে তা করতে হবে স্বয়ং শরীয়াত থেকেই। কোন ইউরোপীয় যুক্তি বা দলীলই এ পর্যায়ে প্রযোজ্য বা গ্রহণীয় হতে পারে না। তাই ইউরোপীয় সংস্কৃতি যখন ধর্ম ও রাষ্ট্রের মাঝে পার্থক্যের দাবী করছে, তখন তা কেবল ইউরোপবাসীদের ক্ষেত্রেই সত্য হতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলাম যদি ধর্ম ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্য বলে ঘোষণা করে থাকে তাহলে সমগ্র ইসলাম সম্পর্কে তা অবশ্যই সত্য হবে। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অভিমতের কোন দাম নেই।

মিসরে আইন শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এমন কিছু যুবকদের সাথে একদিন একত্রে বসবার আমার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে ইসলাম ও শরীয়াত এবং ইসলাম ও রাষ্ট্র পর্যায়ে আলোচনা হল। কথাবার্তার মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম। এদের ধারণা হচ্ছে, ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতির মাঝে কোন সম্পর্ক নেই। তখন আমি তাদের এ ধারণা ও বিশ্বাসের বাতুলতা ও ভিত্তিহীনতা বুঝাতে লাগলাম। আমি বললাম, তোমরা মানব রচিত আইনের ছাত্র হয়ে ইসলামের ব্যাপারে কেমন করে এমন সব কথা বলছো, এ বিষয়ে তো তোমাদের কোন জ্ঞান নেই! তোমরা বলছো, ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য মনে করা হয় না, অথচ এ জন্য তোমরা সেই ইসলামের কোন দলীল উল্লেখ করছো না? তাদের একজন ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন ঘোষণা করেছে, কুরআনের এমন একটি দলীল পেশ করতে আমাকে বলল।

www.bjilibrary.com

তার আসল মতটা যে কি, তা বুঝতে বাকী ছিল না। তাই আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, এ পর্যায়ে সুন্নাহর কোন দলীল পেশ করা হলে তা কি তুমি মেনে নিতে পার না? সে বলস, না। বলল, কুরআনই হল ইসলামের সংবিধান। কুরআনের প্রতি এতখানি ঈমান—অথচ সেই কুরআন সম্পর্কে এ চরম মূর্খতা দেখে আমি বিস্মিত হলাম। যেসব মুসলমান কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ, সেই কুরআনেরই দুটি বিরাট ও সুস্পষ্ট ব্যাপার অস্বীকার করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে দেখে আমার বিশেষ দুঃখ হল। এ দুটো ব্যাপারের একটি হল, ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতিকে পরস্পর সংযুক্ত করেছে এবং অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য বলে ঘোষণা করেছে। আর দ্বিতীয় হলো কুরআনের ন্যায় সুন্নাহ ও মুসলমানের জন্য আইন-বিধানের ক্ষেত্রে অকাট্য দলীল বিশেষ।

এই মুসলমান যুবক দল কুরআনের প্রতি ঈমানদার বটে, কিন্তু তারা জানে না যে, হত্যাকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী, চোর, ব্যভিচারী ও জ্বেনার মিথ্যা দোষারোপকারী প্রভৃতি অপরাধীদের জন্য কুরআন মজীদে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে এ পর্যায়ের আয়াতসমূহ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নরহত্যার শাস্তি স্বরূপ 'কিছাছ' নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।" ('কিছাছ' অর্থ হত্যার বদলে হত্যা, রক্তের বদলে রক্ত)।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَئًا ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهِ -

"কোন মুমিন-মুসলমানের পক্ষে অপর মু'মিন মুসলমানকে হত্যা করা জায়েয নয়। হ্যাঁ, ভুল বশত হলে অন্য কথা। যদি ভুল বশত কেউ কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তা হলে কোন মু'মিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গের নিকট 'দিয়াত' (রক্ত বিনিময় মূল্য) সোপর্দ করে দিতে হবে।"

www.bjilibrary.com

اِنَّمَا جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط

"যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুকাবিলা করবে এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করবে, তাদের শাস্তি হলো হয় তাদের হত্যা করা হবে, না হয় শূলে দেয়া হবে, না হয় তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক দিয়ে কেটে ফেলা হবে। অথবা তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।"

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا

"চোর-পুরুষ বা স্ত্রীকে তার দু'হাত কেটে ফেলো।"

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ صلے

"ব্যভিচারী মেয়েলোক ও পুরুষ—তাদের প্রত্যেককে একশ'টি দোররা মার।"

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً – (سورة النور : ٤)

"যারা নির্দোষ অকলংক চরিত্রের মহিলাদের ওপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষ আরোপ করবে, অতপর তার সমর্থনে চারজন সাক্ষী উপস্থাপিত করবে না, তাদের আশিটি দোররা মার।" —(আন-নূর ঃ ৪)

এছাড়া অসংখ্য অকাট্য দলীল এমনও আছে, যা অনেক বড় বড় অপরাধের কাজকে হারাম প্রমাণ করেছে এবং তার জন্যে দণ্ড নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সে দণ্ড দু'রকমের কাজের দরুন হতে পারে। এক প্রকারের কাজ, যার শাস্তি নির্দিষ্ট যেমন কোন মুসলমানের অমুসলিম—মুর্তাদ হয়ে যাওয়ার অপরাধ এবং তার শাস্তি। আর কতগুলো শাস্তি রয়েছে দেশীয় শাসন-ক্ষমতার নির্ধারিত। যেমন গালাগাল করার ও আমানতে খিয়ানত করার শাস্তি।

এ অপরাধগুলোকে কুরআন মজীদ হারাম ঘোষণা করছে। আর তার জন্যে এসব দণ্ডও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এগুলোকে লোকেরা সাধারণত প্রশাসনমূলক ব্যাপার বলে মনে করে, দ্বীনী বা ধর্মীয় ব্যাপার বলে মনে করে না। তাই ইসলাম যখন দ্বীন বা ধর্ম ও শাসন যন্ত্রের মাঝে পার্থক্য স্বীকার করে না এবং এ আইন ও আদেশসমূহকে কিছু মাত্র উপেক্ষাও করে না, তখন মুসলমানদের কর্তব্য হলো এমন একটা রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা, যা এমন সব আইন বিধানকে বাস্তবায়িত করবে এবং এগুলো বাস্তবায়নকে স্বীয় কর্তব্য বলে মনে করবে।

কুরআন যে, রাষ্ট্রনীতি পেশ করেছে, তাতে রাষ্ট্র সরকারকে অবশ্যই পরামর্শ ভিত্তিক হতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ (سورة اشورى : ٣٨)

"মুসলিম জাতির রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হতে হবে।"—(আশ-শূরা ঃ ৩৮)

রাষ্ট্রনায়ককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ বলে ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ (سورة ال عمران)

"রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদিতে গণ প্রতিনিধিদের সাথে অবশ্যই পরামর্শ করবে।"

এ আয়াতদ্বয়ে পরামর্শ ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ নির্দেশ পালন করার জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা অপরিহার্য। এ থেকেই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে রাষ্ট্র ও ধর্মের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তা যদি সত্যই থাকত তাহলে এ ধরনের নির্দেশ ও বিধান কিছুতেই দেয়া হত না। রাষ্ট্রের রূপ ও নীতি সম্পর্কে এরূপ অকাট্য ঘোষণা কিছুতেই পেশ করত না।

কুরআন অনুযায়ী যাবতীয় প্রশাসন কার্য জনগণের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সুবিচার সহকারে সুসম্পন্ন করতে হবে। সব কাজই করতে হবে আল্লাহর নাযিল করা বিধানের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

www.bjilibrary.com

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহকে উহাদের আসল অধিকারীদের নিকট অর্পণ কর এবং তোমরা যখন জনগণের মধ্যে বিচার ফায়সালা করার দায়িত্ব পাবে, তখন তা অবশ্যই সুবিচার ও ইনসাফ সহকারে সম্পন্ন করবে।"

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ – (المائدة)

"তোমরা লোকদের মাঝে আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করবে।" —(আল-মায়েদা)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ۝

"যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান মুতাবিক বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।"

আর রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর মধ্যে শাসন ও বিচার-ফায়সালা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই কুরআন প্রশাসন ও ধর্মীয় ব্যাপারকে একই বিধানের অন্তর্ভূক্ত করে পেশ করেছে এবং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছে।

কুরআন মুসলমানদেরকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়েছে। বলেছে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط (ال عمران)

"তোমাদের মাঝে এমন এক বাহিনী অবশ্য থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে, ন্যায়ের আদেশ প্রতিষ্ঠা করবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে।" —(আলে-ইমরান)

www.bjilibrary.com

কুরআনে ব্যবহৃত 'মারূফ' শব্দের মানে হল 'ন্যায়'। আর ন্যায় হল তা সবই যা করার নির্দেশ দিয়েছে শরীয়াত। আর 'মুনকার' হচ্ছে তা যা করাকে হারাম করে দিয়েছে। এ আয়াতের দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজে ইসলামের বিধানসমূহ কায়েম করতে সচেষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠন বর্তমান থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয় এবং জরুরী, যা ইসলামে হারাম করা হয়েছে এমন সব জিনিসকে বন্ধ করবে ও তা করতে নিষেধ করবে। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না করে কোন উপায় নেই। কেননা, রাষ্ট্র ও সরকার ইসলাম ভিত্তিক না হলে কুরআনের এ বিধানসমূহ কখনও বাস্তবায়িত হতে পারে না। বস্তুত কুরআন এমনিভাবেই দ্বীন ও দুনিয়া–ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য করে পেশ করেছে।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে দ্বীনী বা ধর্মীয় ব্যাপার ও বৈষয়িক ব্যাপার একত্র করে উল্লেখ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটি আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ আয়াতের পাঠক দেখতে পায়, তাতে একই সঙ্গে ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক—সব রকমের ব্যাপারই সুসমন্বিত হয়ে রয়েছে। যেমন কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি ঃ

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا
وَّبِالْوَلِدَيْنِ اِحْسَانًا ج وَلاَ تَقْتُلُوْٓا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ ط
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ج وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنَ ج وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ط
ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○ (الانعام ١٥١)

"বল হে নবী, তোমরা শুন, আমি তোমাদের পড়ে শুনাচ্ছি তোমাদের রব তোমাদের প্রতি কি কি হারাম করে দিয়েছেন। তাহলো, তোমরা আল্লাহর সাথে একবিন্দু জিনিসকেও শরীক করবে না, পিতা–মাতার সাথে অবশ্যই ভাল ব্যবহার করবে। তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না দারিদ্রের ভয়ে, আমরাই তোমাদের রেজেক দিচ্ছি এবং তাদেরও দেব।

গোপন বা প্রকাশ্য কোন রূপ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার নিকটেও যাবে না। আর তোমরা কোন মানুষকে হত্যা করবে না—আল্লাহ তা হারাম করে দিয়েছেন। অবশ্য সত্য ভিত্তিক কারণ থাকলে অন্য কথা। এসব কথাই হচ্ছে মহান আল্লাহর উপদেশ নির্দেশ এবং দেয়া হচ্ছে এ আশায় যে, তোমরা এর গুরুত্ব অবশ্যই অনুধাবন করবে।" —(আল-আনয়াম ঃ ১৫১)

এ একটি মাত্র আয়াত। কিন্তু এতে এক সংগেই বহুবিধ কথা বলা হয়েছে। এ আয়াত শিরক, পিতা-মাতার সহিত সম্পর্কচ্ছেদকরণ, নরহত্যা, নির্লজ্জতা-অশ্লীলতা ও শিশু হত্যা ইত্যাদি কাজগুলোকে হারাম ঘোষণা করছে। বস্তুত দ্বীন ও দুনিয়া—তথা ধর্ম ও বৈষয়িকতার একত্র সমন্বয় এর চাইতে বেশী আর কিছু হতে পারে কি?

কুরআন মজীদ দ্বীন ও দুনিয়া-ধর্ম ও বৈষয়িকতার সব কিছুকে কুরআনেরই ভিত্তিতে গড়ে তুলতে নির্দেশ দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ - (الحج)

"যাদেরকেই আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দিয়ে কোথাও প্রতিষ্ঠিত করব, তারা নামায কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে ও অন্যায়ের করবে প্রতিরোধ।" —(আল-হাজ্জ)

এ আয়াত অকাট্যভাবে ঘোষণা করছে যে, আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেটাই যা তার প্রজা সাধারণের মধ্যে নামায কায়েম করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাকাত আদায় ও বন্টন ব্যবস্থা চালু করবে। আল্লাহ যে যে কাজের আদেশ করেছেন, তাকেও কার্যকর করে তুলবে এবং যে যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সে সে কাজ বন্ধ করে দেবে। এ আয়াত অনুযায়ী একটি দ্বীন ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য হয়ে গেছে। গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলা ছাড়া এ কাজ কিছুতেই সুসম্পন্ন হতে পারে না।

এভাবে কুরআন মজীদে অনেক অকাট্য ঘোষণা রয়েছে, এখানে যার সবগুলোর উল্লেখের অবকাশ নেই। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন এবং রাষ্ট্রীয়

পর্যায়ের যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদ দূরীকরণ, যুদ্ধ, সন্ধি, পারস্পরিক লেন-দেন, ব্যক্তিগত কর্তব্যাকর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব—সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কুরআন মজীদ ধনীদের ধন-সম্পদে গরীবদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে ইয়াতীম, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকের অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করেছে। মোটকথা, বৈষয়িক ব্যাপারাদির এমন কোন একটা দিককেও কুরআন ছেড়ে দেয়নি যে বিষয়ে তাতে কোন বিধানের উল্লেখ হয়নি। বরং সব বিষয়েই আইন ও বিধান রয়েছে। সর্বোপরি সমগ্র বৈষয়িক ব্যাপারকে দ্বীন ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে তোলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরং এ দ্বীন ও নৈতিকতাকেই রাষ্ট্র শাসনের মৌল বিধানরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা শাসক ও শাসিত সবাইকেই মানতে বাধ্য করছে। বস্তুত দ্বীন ও দুনিয়া—ধর্ম ও রাষ্ট্রকে একত্রে সমন্বিত করার এর চাইতে বড় ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। ফলে ইসলামে গোটা রাষ্ট্রই 'দ্বীন' বা ধর্মীয় ব্যাপার হয়ে গেছে, আর গোটা ধর্মই হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার।

কুরআন যে রাসূলে করীম (সা) এবং তাঁর কার্যাবলীকে মুসলমানদের জন্যে শরীয়াত বানিয়ে দিয়েছে এবং তা অনুসরণ করা যে মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য, তা একালের মুসলিম ও কুরআন বিশ্বাসী যুবক দল আদৌ জানতে পারেনি। আইন প্রণয়ন ও তা অনুসরণের ব্যাপারে রাসূলের আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব এদের বোঝানো বা শিখানো হয়নি। রাসূলে করীম (সা) কখনো নিজের ইচ্ছা বা কল্পনার ভিত্তিতে কথা বলতেন না। যা তাঁর নিকট অহী হয়ে আসত আল্লাহর নিকট থেকে, তিনি কেবল তাই বলতেন ও করতেন। ফলে যে বিষয়ে কুরআন স্পষ্ট কিছু বলেনি, সে ক্ষেত্রে রাসূলকে অনুসরণ করাই কর্তব্য। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُوْحٰى (النجم)

"রাসূল নিজের ইচ্ছেমত কথা বলেন না। তিনি যাই বলেন, তা সবই অহী, যা অহী হয়ে (আল্লাহর নিকট থেকে) নাযিল হয়।" —(আন-নাজম)

রাসূলের আনুগত্য স্বীকার ও অনুসরণ পর্যায়ে কুরআনে অসংখ্য নির্দেশ ও বিধান উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে তার কয়েকটির উল্লেখ করা যাচ্ছে।

www.bjilibrary.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ - (النساء)

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার কর। অনুসরণ কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য হতে (নির্বাচিত) রাষ্ট্র কর্তাদেরও।"

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ (النساء)

"যে লোক রাসূলের অনুসরণ করে চলল, সে আল্লাহকে মেনে চলল।"

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

"বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালো বাস, তাহলে তোমরা আমাকে (রাসূলকে) অনুসরণ করে চল, তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালো বাসবেন।"

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

"আর রাসূল (সা) তোমাদের যা দেয় তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যে কাজ করতে নিষেধ করে, তোমরা তা থেকে বিরত থাক।"

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

"তামার আল্লাহর নামে শপথ, লোকেরা ঈমানদার হতেই পারে না, যদি তোমাকে তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে বিচারক বলে মেনে না নেয় এবং এরূপ না হয় যে, তুমি যা কিছু ফায়সালা করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে কোন কুণ্ঠা ও দ্বিধা পাবে না এবং তারা (তোমার ফায়সালাকে অবনত মস্তকে) মেনে নেবে।"

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝

www.bjilibrary.com

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম উন্নত আদর্শ রয়েছে তাদের জন্যে, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী-আশাবাদী এবং খুব বেশী করে আল্লাহর যিক্র করে।"

দ্বিতীয়, শরীয়াত একালে অচল?

ইউরোপীয় সংস্কৃতিবানদের ধারণা হল, শরীয়াত আধুনিককালের বিধান হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু এ ধারণার অনুকূলে কোন যুক্তি তারা পেশ করতে পারেনি। তারা যদি নির্দিষ্টভাবে শরীয়াতের কোন একটি বিষয় সম্পর্কে বলত যে, সেটা একালের উপযুক্ত নয় এবং সেই সঙ্গে তার কারণও বিশ্লেষণ করত, তাহলে অবশ্য তাদের কথার একটা দাম হতো এবং আমরাও এ বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে পারতাম। প্রয়োজন হলে তাদের যুক্তি খণ্ডন করতাম। কিন্তু তাদের এ দাবী শরীয়াতের কোন একটি বিষয় নিয়ে নয়, গোটা শরীয়াত—সমগ্র শরীয়াতকেই তারা এ যুগে অচল বলে ভাবে। ভাবে এবং বলে বটে, কিন্তু তার স্বপক্ষে ও সমর্থনে একটি যুক্তি প্রমাণও পেশ করেনি। শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজের নিকট এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার যেমন, তেমনি দুঃখজনকও।

আর এটা যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা খুব বড় একটা দাবী করে, কিন্তু তার অনুকূলে কোন যুক্তি-প্রমাণ দেয় না—সেই সংগে এও জানি যে, তারা শরীয়াত সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ও মূর্খ তখন আমরা অকাতরে বলতে পারি যে, তাদের দাবী সম্পূর্ণ মূর্খতা প্রসূত, এটা অমূলক দোষারোপ এবং পুরাপুরি যুক্তিহীন কথা।

বস্তুত শরীয়াত বা আইন ও বিধানসমূহের কার্যকারিতা ও বাস্তবতা নির্ভর করে তার মূলনীতিসমূহের কর্মোপযোগিতার ওপর। আর ইসলামী শরীয়াতে একটি মূলনীতিও এমন নেই যা বাস্তবায়িত হবার উপযুক্ত নয়। ইসলামী শরীয়াতের কতিপয় মূলনীতি নিয়ে পর্যালোচনা করলেই আমাদের এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

ইসলামী শরীয়াতের একটি প্রখ্যাত মূলনীতি হল জনগণের মধ্যে নির্বিশেষ সাম্য প্রতিষ্ঠা। কুরআন মজিদে ঘোষিত হয়েছে ঃ

www.bjilibrary.com

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط

"হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও শাখা বংশে বিভক্ত করেছি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা এর সাহায্যে পরস্পরের নিকট পরিচিত হবে। নিসন্দেহে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মাঝে সব চাইতে বেশী আল্লাহ ভীরু।"

নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

الناس سواسية كاسنان المشط الواحد لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى -

"সমস্ত মানুষ একটি চিরুনীর কাঁটাসমূহের মতই সমান। আরবের কোন অধিক মর্যাদা নেই অনারবের ওপর—তাকওয়া ভিন্ন অন্য কোন হিসেবে।"

ইসলামী শরীয়াত তেরোশ বছরেরও অধিককাল থেকেই এ মূলনীতি পেশ করে আসছে। অথচ মানব রচিত আইন বিগত অষ্টাদশ শতকের পূর্বে এ ধরনের কোন মূলনীতির সহিত আদৌ পরিচিত ছিল না। এখনো ইউরোপ–আমেরিকার বিরাট বিরাট রাষ্ট্রসমূহ সাম্যের এ নীতিকে বাস্তবায়িত করতে পারেনি।

শরীয়াত প্রথম দিন থেকেই আজাদী ও স্বাধীনতার নীতি উপস্থাপিত করেছে। চিন্তার স্বাধীনতা, আকীদা–বিশ্বাসের স্বাধীনতা, বাক–স্বাধীনতা প্রভৃতি ইসলামেরই অবদান। এ পর্যায়ে ইসলামের অনেক মূলনীতি রয়েছে। এখানে কতিপয় মূলনীতিমূলক আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

"বল হে নবী! তোমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখ আকাশ মণ্ডলে ও পৃথিবীতে কি রয়েছে।"

www.bjilibrary.com

وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُوا الاَلْبَابِ

"কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।"

لاَ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

"ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তির স্থান নেই।"

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ

وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط

"তোমাদের মধ্যে একটি বাহিনী অবশ্যই এমন হতে হবে যারা কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে, ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে।"

আযাদী বা স্বাধীনতার তিনটি বিভাগ এমন, যার সাথে মানব রচিত আইন ও গোটা ইউরোপীয় সভ্যতা ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত এক দিনের জন্যও পরিচিত হতে পারেনি। অথচ এ কালের এ মূর্খ শিক্ষিতরা ইসলামের এসব অবদানের কথা স্বীকার করছে না এবং এগুলোকে ইউরোপীয় সভ্যতার অবদান বলে মিথ্যামিথ্যি দাবী জানাচ্ছে।

ইসলামী শরীয়াতের আর একটি বিশেষ অবদান হলো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সুবিচার। নিরংকুশ ন্যায়পরায়ণতা। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط (النساء)

"তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, তখন অবশ্যই সুবিচার করবে।"

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا (المائدء)

"কোন বিশেষ শ্রেণী বা জাতির লোকদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কোনরূপ অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে।"

www.bjilibrary.com

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَا للّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ(النساء)

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা সকলে সুবিচার ও ন্যায়নীতি নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, আল্লাহর জন্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে, সে সুবিচার যদি তোমাদের নিজেদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও হয়-যদি তারা ধনী কিংবা গরীবও হয়। এদের অপেক্ষা আল্লাহই তো উত্তম। অতএব তোমরা নফসের খাহেশের অনুসরণ করতে গিয়ে অবিচার করে বসো না।"

এসব ইসলামেরই উপস্থাপিত মূলনীতি। মানবীয় আইন এসবের সাথে পরিচিত হয়েছে অষ্টম শতকের শেষাংশে মাত্র তার পূর্বে নয়।

আধুনিক আইন বিধান এ তিনটি মৌলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানব রচিত আইনের বহু পূর্বে—প্রায় এগার শতক পূর্বে—ইসলামী শরীয়াতই এ সব উপস্থাপিত করেছে। তাহলে আধুনিক আইন একালে—এই আধুনিক যুগে কি করে চলতে পারছে? এসব প্রাচীনতম ও শরীয়াত উপস্থাপিত মূলনীতি যদি আধুনিক আইনের ভিত্তি হয়ে একালে চলার যোগ্য হতে পারে, তাহলে এ মূলনীতিসমূহের আসল উদগাতা ইসলামী শরীয়াত কেন একালে চলতে পারবে না?

ইসলামী শরীয়াত পরামর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা উপস্থাপিত করেছে, করেছে সেই প্রথম অবতীর্ণ হওয়ার দিন থেকেই। প্রথম দিকেই কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ (الشورى : ٣٧)

"তাদের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাপার তাদের পরস্পরের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ হয়ে থাকে।"—(আশ-শূরা ঃ ৩৮)

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ (ال عمران : ١٥٩)

www.bjilibrary.com

"এবং তাদের সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ কর।"—(আলে-ইমরান ঃ ১৫৯)

এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াত মানব রচিত আইনের তুলনায় এগারশ বছর সম্মুখের দিকে অগ্রবর্তী হয়ে আছে। আর ইংরেজী আইন শরীয়াতের দশ শতাব্দী পর এ নীতি গ্রহণ করেছে। কাজেই মানব রচিত বিধান এ ব্যাপারে কোন নতুন অবদান উপস্থাপিত করতে পারেনি। ইসলামী শরীয়াত যে নীতি দিয়ে দায়িত্ব সমাপ্ত করেছে, মানব রচিত আইন সেখান থেকেই তার কাজ শুরু করেছে।

ইসলামী শরীয়াত প্রথম দিন থেকেই রাষ্ট্র শাসক নিয়ন্ত্রণে রাখার পদ্ধতি ও আদর্শ পেশ করেছে। বলেছে, সে হবে জনগণের প্রতিনিধি। তার সীমা-লংঘনমূলক কাজ-কর্ম ও ভুল ভ্রান্তির বিষয়ে জনগণের নিকট জওয়াবদিহি করতে সে বাধ্য হবে। ফলে শরীয়াত শাসক ও শাসিত সকলকেই একই মর্যাদায় সংস্থাপন করেছে। তাদের প্রত্যেককেই শরীয়াতের বিধানের বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। আর এ ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্বের অবকাশ রাখেনি, শাসিতদের ওপর অবিচার হওয়ার কোন সুযোগ থাকতে দেয়নি। আর এ সব কিছুই করা হয়েছে মানবীয় সাম্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

আধুনিক রাষ্ট্রও এ কথার গুরুত্ব স্বীকার করে। কিন্তু মানবীয় আইনের এগারশ বছর পূর্বেই ইসলামী শরীয়াত এ নীতিসমূহকে বাস্তবায়িত করেছে। তাহলে এ যুগে শরীয়াতের আইন চলতে পারে না, এমন কথা বলা যায় কোন্ যুক্তিতে?

ইসলামী শরীয়াত মাদক দ্রব্য—শরাব—হারাম করেছে এবং তালাকের বৈধতা স্বীকার করেছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ -(المائدة : ٩٠)

"হে ঈমানদার লোকেরা, নিশ্চয় জানবে, মাদক দ্রব্য, মদ্যপান, জুয়াখেলা, বেদী স্থাপন ও গণনা অপবিত্র শয়তানী কাজ, অতএব তোমরা তা পরিহার কর।"—(আল-মায়েদা ঃ ৯০)

www.bjilibrary.com

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ

"তালাক দু'বার বলবে। অতপর হয় সঠিকভাবে স্ত্রীকে রেখে দিবে, না হয় ভাল ব্যবহার ও সদাচার সহকারে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিবে।"

—(আল–বাকারা ঃ ২২৯)

কিন্তু মানব রচিত আইন মদ্যপান হারাম ঘোষণা করেনি, আর তালাকের কোন ব্যবস্থাও তাতে নেই। সম্প্রতি অবশ্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কোন কোন আইন মদ্যপান সম্পূর্ণ ও বিনা শর্তে হারাম বলে, কোন কোন আইন আংশিক নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আবার কোন কোন আইনে তালাক বিনা শর্তে বৈধ, যদিও অপর কোন তালাকের অনুমতি শর্তাধীন। মানবীয় আইন শরীয়াত থেকে নানা বিধান গ্রহণ করেও যদি এ যুগের যোগ্য হতে পারে। তাহলে সমস্ত আইনের মূল ইসলামী শরীয়াত এ কালে চলবে না কেন?

ইসলামী শরীয়াতই সর্বপ্রথম সামাজিক ও সামষ্টিক সহযোগিতার বিধান পেশ করেছে। পেশ করেছে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪

"তোমরা পরস্পরের সাথে সহযোগিতা কর নেক কাজ ও আল্লাহ ভীরুতার কাজে। আর সহযোগিতা করবে না গুনাহ ও নাফরমানী তথা আল্লাহদ্রোহিতার কাছে।" —(আল- মায়েদা ঃ ২)

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

"লোকদের ধন–মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।"—(আল–মা'আরিজ ঃ ২৪–২৫)

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -

(التوبه : ١٠٣)

"ধনশালীদের নিকট থেকে ছাদকা গ্রহণ কর। এ করে তুমি তাদের পবিত্র করবে এবং এর দ্বারা তাদের পরিচ্ছন্ন ও কলুষ মুক্ত করে তুলবে।"

www.bjilibrary.com

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِيْنِ وَالْعَٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥

"ছাদকা-যাকাত ও দান ফকীর, মিসকীন, আদায়কারী কর্মচারী, যাদের মন জয় করা লক্ষ্য, বন্দী, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে এবং পথিকদের জন্যে নির্দিষ্ট। এটা যথারীতি আদায় করা আল্লাহর নিকট থেকে ধার্যকৃত ফরয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ।" —(আত-তাওবা ঃ ৬০)

مَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ (الحشر : ٧)

আল্লাহ গ্রামবাসীদের নিকট থেকে যা কিছু তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, তা আল্লাহ, রাসূল, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্যে যেন- ধন-সম্পদ তোমাদের সমাজের কেবল ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে।" —(আল-হাশর ঃ ৭)

ইসলামী শরীয়াত এ তিনটি আদর্শ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে তেরশ বছরেরও বেশীকাল পূর্বে। কিন্তু অমুসলিম জগত এ সম্পর্কে কেবল বর্তমান শতাব্দীতেই এ বিষয়ে ওয়াকিফহাল হতে পেরেছে, তার পূর্বে তারা এ বিষয়ে কিছু জানত না। বর্তমান সভ্যতা অবশ্য এ ব্যবস্থাত্রয়কে গ্রহণ করেছে এবং এ যুগেও মোটামুটি নানাভাবে নানারূপে তা কার্যকর হতে পারছে।

শরীয়াত খাদ্যদ্রব্য আটক ও গোপন করে পুঞ্জীভূত করে রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। দ্রব্যমূল্য অত্যধিক করাকেও নিষেধ করেছে। ঘুষ-রিশ্ওয়াতকে হারাম করেছে। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

لا يحتكر الاخاطىء

www.bjilibrary.com

"কেবল ভ্রান্ত ও অপরাধী ব্যক্তিই খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত ও আটক করে রাখতে পারে (অধিক মুনাফা লুটার উদ্দেশ্যে)।"

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَلاَ تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

"তোমরা তোমাদের পরস্পরের ধন-মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করবে না। তোমরা শাসকদের নিকট ঝুঁকে পড়ো না। এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা জেনে-শুনে লোকদের ধন-মালের কিছু অংশ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করবে।" —(আল-বাকারা ঃ ১৮৮)

এ পর্যায়ের কোন মূল বিধানের সাথে দুনিয়ার সমাজ নিজস্বভাবে পরিচিত হতে পারেনি, এ যুগেই কেবল সর্বপ্রথম পরিচিত হয়েছে।

ইসলামী শরীয়াত সব রকমের নির্লজ্জতা, নগ্নতা, অশ্লীলতাকে হারাম করেছে—তা প্রকাশ্য হোক বা গোপন। আর পাপ কাজ, অন্যায় ও অকারণ বিদ্রোহ বা সীমালংঘনকে হারাম করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ - (الاعراف : ٣٣)

"বল হে নবী। আমার রব নিসন্দেহে হারাম করে দিয়েছেন গোপন বা প্রকাশ্য নির্লজ্জতা-পংকিলতা, অন্যায়-পাপ এবং অকারণ বিদ্রোহ বা সীমালংঘন করাকে।" —(আল-আ'রাফ ঃ ৩৩)

ইসলামী শরীয়াত কল্যাণের দিকে জনগণকে আহবান জানানো, ন্যায়ের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط (ال عمران : ١٠٤)

www.bjilibrary.com

"তোমাদের মধ্যে একটি বাহিনী অবশ্যই এমন হতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে এবং ন্যায়ের প্রবর্তন-প্রতিষ্ঠা করবে ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে।" —(আলে-ইমরান ঃ ১০৪)

এ সব হলো শরীয়াতের মৌল ব্যবস্থার অন্যতম, অতীব উত্তম আদর্শ। মানুষ যতটা উন্নতমানের ব্যবস্থা কল্পনা করতে পারে, এটা ততখানি উন্নত ব্যবস্থা। তাহলে এমন উন্নত উচ্চমানের ব্যবস্থা সম্বলিত শরীয়াত এ কালে চলতে পারবে না কেন?

এভাবে আমরা যদি এ কালের মানবতা, সামাজিকতা ও আইন বিধানের মৌল নীতিসমূহ সন্ধান করি—যার সাথে এ কালের মানুষ পরিচিত হতে পেরেছে এবং যেসব নিয়ে তারা গৌরব করে, তাহলে এর প্রত্যেকটিই আমরা ইসলামী শরীয়াতে দেখতে পাব অতীব উত্তম ও উন্নত মানে। এ কালের ব্যবস্থাপনার চাইতেও অনেক ভালভাবে ইসলামের এই ব্যবস্থাসমূহ মানবতার কল্যাণ করতে সক্ষম।

আলোচনার দীর্ঘতার ভয় না থাকলে এ পর্যায়ে আরো অনেক কথা ও যুক্তি প্রমাণের উল্লেখ করা যেত।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ কালে শরীয়াতের আইন চলতে পারে না বলে যে দাবী করা হচ্ছে, তার আসল কারণ হল শরীয়াত সম্পর্কে এরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে সম্পর্কে তাদের কোনই ধারণা নেই। আর প্রকৃত ও বাস্তব ব্যাপারের সাথেও তাদের কোন পরিচিতি নেই, তাদের কথার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। তাদের তরফ থেকে একটি মাত্র ওযরই পেশ করা যেতে পারে। আর তা হলো তারা এতটুকু জানতে পেরেছে যে, প্রাচীন সমাজের আইন-কানুন অত্যন্ত পুরাতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ কালে সেসব ভিত্তি অস্বীকৃতব্য। আর এ কথাটাকে তারা একটা সাধারণ সত্য মনে করে বসেছে এবং তাকেই তারা ইসলামী শরীয়াতের ওপর প্রয়োগ করেছে। সে কারণে ইসলামী শরীয়াতকেও তারা অত্যন্ত সেকেলে মনে করে নিয়েছে। বস্তুত ইসলামী শরীয়াত যে—পুরাতন—অনেক দিন আগের প্রবর্তিত ব্যবস্থা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব রচিত আইন ও ইসলামী শরীয়াতের মাঝে যে আসমান-যমীন তফাত রয়েছে তা তারা আদৌ বুঝতে পারেনি। 'পুরাতন' বলেই যদি

www.bjilibrary.com

কোন কিছু বাতিল করে দিতে হয় তাহলে দুনিয়ার অনেক কিছুকেই বাতিল ভাবতে হবে। তাহলে যে, আমাদের জীবনই অচল হয়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়ার অন্যান্য বহু পুরাতনকেই পুরাতন বলে প্রত্যাখ্যান করি না। তাহলে শরীয়াতকেই বা তা করা হবে কেন?

তৃতীয় ঃ শরীয়াতের কোন কোন বিধান সে কালের জন্যে নির্দিষ্ট

ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত কোন কোন লোক বলে থাকেন, শরীয়াত মোটামুটিভাবে এ কালেও চলতে পারে বটে, তবে তার কোন কোন বিধান অবশ্য এ কালের জন্যে নয়, তা কেবল মাত্র সে কালের জন্যেই চালু করা হয়েছিল। তাই এ কালে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে কিংবা অচল হয়ে পড়েছে। তারা ফৌজদারী আইনের কোন কোন ধারা সম্পর্কেই এ কথা বলেছেন। তারা বিশেষভাবে আপত্তি তুলেছে ইসলামী শরীয়াতের সেসব দণ্ড বিধান সম্পর্কে, মানব রচিত আইনে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। যেমন পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা, হাতকাটা ইত্যাদি। তাদের এ দাবীর সমর্থনে তাদের নিকট প্রমাণ চাইলে তারা বোবা হয়ে যায়। আসলে এটা তাদের বদ ধারণা মাত্র, এর মূলে কোন সত্য নেই। কেবল মাত্র ধারণা অনুমানের দ্বারা কখনো প্রকৃত সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না।

তারা অনুরূপ ধরনের কোন আইন মানব রচিত আইনে দেখতে পায় না বলে এ ধরনের কথা-বার্তা বলে এবং এ সব আইনের আঘাত থেকে তারা বাঁচতে চায়। কিন্তু মানব রচিত আইনও যদি আগামীকাল এ সব দণ্ডই গ্রহণ করে তাহলে সাথে সাথে তাদের ধারণা বদলে যাবে এবং বলবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এতো চিরন্তন আইন।

বস্তুত এসব মুসলিম নামধারী ব্যক্তিরা যদি ইসলামকে জানত ও বুঝত, তাহলে তারা এ ধরনের কথা কখনো বলত না। কেননা, মূলতই ইসলামের আইন কোন বিশেষ সময়ের জন্যে নয়, তা চিরন্তন এবং শাশ্বত। রাসূলে করীমের (সা) জীবদ্দশায় যে আইন বাতিল হয়ে যায়নি, তা কিয়ামত পর্যন্ত কখনো বাতিল হতে পারে না। কুরআন তো রাসূলে করীমের (সা) ইন্তেকালের পূর্বে স্পষ্ট ভাষায় ও উদাত্ত কন্ঠে ঘোষণা করে দিয়েছে যে, দ্বীন-ইসলাম

সুস্পষ্ট, পরিপূর্ণ, তাতে কিছু বাড়ানোও যেতে পারে না, তা থেকে কিছু বাদ দেয়াও সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط (المائدة : ٣)

"আজকের দিনে তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার এ নিয়ামত দান নিশেষ করলাম। ইসলামকেই তোমাদের জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে আমি মনোনীত করে দিলাম।" —(আল-মায়েদা ঃ ৩)

এ সব মুসলমান কি এতটুকু কথা বুঝে. না যে, ইসলামের কোন কোন বিধান যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হতো তাহলে অবশিষ্ট বিধান সম্পর্কেও তাই সত্য হতো। আর প্রত্যেককেই যদি ইসলাম সম্পর্কে ইচ্ছেমত কথা বলার অধিকার দেয়া হত, তাহলে ইসলাম বলতে কিছু থাকত না।

চতুর্থ, কোন কোন আইন অপ্রয়োগযোগ্য

এ মত যারা পোষণ করে, তারা আবার পূর্বোক্ত মতকে স্বীকার করতে রাজী নয়। তারা বলে না, শরীয়াতের বিধান চিরন্তন ও অবশ্য বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে কোন কোন দণ্ড বিধান এমন যা একালে কার্যকর করা (তাদের মতে) সম্ভব নয়। আর তা হল হাত কাটা ও সংগেসার করার আইন। তার কারণ হিসেবে তারা ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের দুর্বলতার কথাই উল্লেখ করেন। বিশেষ করে এ জন্যেই যে, মুসলিম দেশসমূহে বর্তমানে অনেক বিদেশী বা বিধর্মী লোক বসবাস করছে। তাদের ওপর এ আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে না কিংবা এ আইন প্রয়োগ করা হোক, তা তাদের রাষ্ট্রগুলো পসন্দও করবে না। এক কথায় দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের অসন্তোষ উদ্রেক হওয়ার ভয়েই এ সব আইন প্রয়োগ করাটা এরা ভালো মনে করে না।

কিন্তু এ মত ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেননা, আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন ঃ

www.bjilibrary.com

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

"তোমরা মানুষকে ভয় করো না, ভয় কর কেবল মাত্র আমাকে। তোমরা আমার আয়াতসমূহকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিও না। আর যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারাই কাফের।"—(আল-মায়েদা ঃ ৪৪)

এ ধরনের মত যারা পোষণ করে, তাদের সম্পর্কে বলা যায়, বহু কয়জন ফিকাহ্‌বিদ বিদেশী লোকদের ওপর তারা যেনা ও চুরির অপরাধ করলে এ আইন প্রয়োগ করতে চান না। কাজেই সে ক্ষেত্রে যে, এ আইন প্রয়োগ করা যায় না, এ মতটি অন্যায় বা ভুল নয়।

এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে, সংগেসার করার দণ্ড অতি উচ্চ ও আদর্শ শাস্তি। যেনার অপরাধ অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলেই এ দণ্ড কাউকে দেয়া যেতে পারে। আর সেরূপ কঠিন ও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য সহজলভ্য নয়। রাসূলে করীম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যেসব অপরাধের শাস্তিস্বরূপ 'সংগেসার' করার দণ্ড দেয়া হয়েছে তার সব কয়টিই হয়েছে অপরাধীর নিজস্ব স্বীকার উক্তির ভিত্তিতে, নিছক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। আর এই অকাট্য সাক্ষ্য বা নিজস্ব স্বীকৃতি—এ দুটি পন্থা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যেনা প্রমাণ করা যেতে পারে না। আর সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে চারজন বিশ্বস্ত পুরুষ সাক্ষী প্রয়োজন। সে সাক্ষ্যও হতে হবে মূল কাজটা সংঘটিত হওয়ার সময় নিজ নিজ চক্ষে দেখতে পাওয়ার ভিত্তিতে। আর এ ধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটতে পারে। তেমনি এমন ঈমানদার লোকও এখন সুলভ নয়, যারা যেনা করে তা স্বীকার করবে এবং তার জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি গ্রহণ করতে রাজী হবে।

পঞ্চম, ইসলামী ফিকাহ্, ফিকাহ্‌বিদদের রায়

ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত একশ্রেণীর লোক মনে করে যে, ইসলামী ফিকাহ্'র অধিকাংশ হচ্ছে ফিকাহ্‌বিদদের মনগড়া কল্পনা প্রসূত। অবস্থা হচ্ছে এই যে, ইসলামী ফিকাহ্‌র এমন কোন একটা 'মত' যদি তাদের সম্মুখে পেশ করা যায়, যার কোন তুলনাই মানব রচিত আইনে দেখতে

পাওয়া যায় না, থাকলেও এই শেষের দিকে শামিল হয়েছে—তা হলে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। তারা দেখতে পায়, সপ্তম-অষ্টম খৃস্টশতকে ইসলামী ফিকাহ্‌বিদরা আইনের দিক দিয়ে এত উচ্চ মানে পৌঁছে গিয়েছিলেন, যেখানে আধুনিক আইনবিদরা পৌঁছার ধারণাও করতে পারেন না। তাঁরা যদি পৌঁছেও থাকেন, তবুও তা সপ্তদশ বা অষ্টদশ শতকে, তার পূর্বে নয়। এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আমাকে বলেছেন যে, তারা মনে করেন, ফিকাহ্‌র বিভিন্ন মাযহাবের ঈমামগণ সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। কেননা, তাঁরা তাঁদের চিন্তা শক্তির দিক দিয়ে সাধারণ মানবীয় চিন্তাশক্তিকে অন্তত তেরশ বছর ছাড়িয়ে গেছেন।

ইসলামী ফিকাহ মুসলিম ফিকাহ্‌বিদদের কল্পনা প্রসূত বলে অভিযোগ তোলা নিসন্দেহে এক মারাত্মক ভুল। আর যারা ধারণা করে যে, ইমামগণ মানবীয় চিন্তাকে ছাড়িয়ে গেছেন, তাদের ধারণাও ঠিক নয়। আসল কথা হলো, ইসলামী ফিকাহ, তাঁদের উন্নত মানের চিন্তাশক্তির ফসল, এ কথা ঠিক, কিন্তু তাঁরা সব কথা নিজেদের চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে মনগড়াভাবে বলেছেন, এ কথা ঠিক নয়, তারা তো সর্ববিষয়ে শরীয়াতকেই সামনে রেখেছেন। শরীয়াতের মূলনীতি ও ভিত্তিসমূহকে সামনে রেখেই তাঁরা ইসলামী আইন-বিধান সম্পর্কে গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁরা শরীয়াতী দলীলের ব্যাখ্যা করেছেন এবং যাবতীয় মত তারই ভিত্তিতে প্রকাশ করেছেন। এ করে তাঁরা ইজতিহাদের দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। এ ক্ষেত্রে তাঁরা তাদের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে শরীয়াতের বাস্তব ব্যবস্থাকে—শরীয়াত বাস্তবায়নের পন্থা ও পদ্ধতিকে উপস্থাপিত করেছেন। এতে যদি তাঁরা চিন্তার দিক দিয়ে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাতো সেই শরীয়াতেরই গৌরব, যা সব মানবীয় চিন্তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে—যে পর্যন্ত মানুষের চিন্তা কখনো পৌঁছতে পারে না।

ফিকাহবিদরা নিরংকুশ সাম্যের বিধান নিজেরা রচনা করেননি, না অবাধ সাম্যের কথা তাঁরা কল্পনা করে বলেছেন। নিরপেক্ষ সুবিচারের কথাও তাঁদের অবাঞ্ছিত নয়। ফিকাহ্‌বিদরা তা কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই জানতে পেরেছেন এবং সেখান থেকেই তা ঠিক তেমনি রূপেই পেশ করেছেন, যেমন কুরআন ও সুন্নায় তাঁরা পেয়েছেন।

www.bjilibrary.com

পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র শাসন পরিচালনা করতে হবে, ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও মতের ভিত্তিতে নয়, ফিকাহ্‌বিদরা এ কথা কল্পনা করে বলেননি। শাসককে নিয়ন্ত্রণ করা ও তাকে জনগণ ও আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে পেশ করার নীতিও ফিকাহ্‌বিদদের কল্পিত নয়। শাসক নিজের ক্রিয়া কর্ম ও ভুল-ভ্রান্তির জন্যে জনগণ ও আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে বাধ্য, মদ্যপান নিষিদ্ধ, প্রয়োজন মত তালাক দেয়া যেতে পারে, এর কোন একটি কথাও ফিকাহ্‌বিদরা নিজস্ব কল্পনার ভিত্তিতে বলেননি। কুরআনের অকাট্য সুস্পষ্ট আয়াত থেকেই এ সব প্রমাণিত। ইতিপূর্বে এ সব কথাই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সভ্যতা ও নাগরিক জীবনের লেন-দেনের ক্ষেত্রে লিখে নেয়ার বাধ্য-বাধকতার কথা ফিকাহ্‌বিদরা নিজেদের ইচ্ছে মত বলেননি। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে লেন-দেনের সাক্ষী রাখার কথাও কোন কল্পনা নয়। এ সব কথা কুরআন থেকেই প্রমাণিত। তাতেই বলা হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ط ... ... وَلَا تَسْئَمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ط ... ... اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا تَكْتُبُوْهَا ط-

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন মিয়াদের জন্যে লেন-দেন করবে, তখন তা তোমরা অবশ্যই লিখে রাখবে। তা ছোট হোক কি বড়, কোন অবস্থায়ই তা লিখে রাখতে তোমরা কুণ্ঠিত হবে না। তবে যদি নগদ ও উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার হয়—যাতে উপস্থিত ক্ষেত্রেই পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান চূড়ান্ত হয়ে যায়-তাহলে তা না লিখলেও কোন দোষ তোমাদের হবে না।" (নগদ লেন-দেন বা ক্রয় বিক্রয়ে লিখতে নিষেধ করা হয়নি। লিখে রাখাকে অপসন্দ করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে না লিখলে দোষ নেই)।—(আল-বাকারা ঃ ২৮২)

www.bjilibrary.com

লেন-দেনের কথা লিখে রাখা এবং যে লিখতে জানে তার তা লিখে দেয়ার দায়িত্বের কথাও ফিকাহ্‌বিদরা মনগড়াভাবে বলেননি। কুরআনই এ ব্যবস্থা পেশ করেছে। বলা হয়েছে ঃ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ط فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لاَيَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ط

"যার ওপর অধিকার রয়েছে—যার ওপর স্বত্ত্ব আরোপিত হয়, তারই তা লিখে দেয়া উচিত এবং তার কর্তব্য আল্লাহকে ভয় করা। তার মধ্যে সে যেন কোন জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত না করে। যার ওপর স্বত্ত্ব আরোপিত হয় সে যদি নির্বোধ বা অশিক্ষিত কিংবা দুর্বল হয়, অথবা সে নিজে লিখে দিতে না পারে, তাহলে তার পৃষ্ঠপোষক যেন তা বিচার ও ন্যায় পরায়ণতার সহিত লিখে দেয়।"—(আল-বাকারা ঃ ২৮২)

মানুষের প্রতি সহজতা বিধানের মতও ফিকাহ্‌বিদদের কল্পনা প্রসূত নয়। আইনের পরিভাষায় তাকে বলা হয় পাত্রের পরিবর্তন। ফিকাহ্‌বিদরা এ মতও গ্রহণ করেছেন কুরআন শরীফ থেকে। বলা হয়েছে ঃ

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ط (البقره : ٢٨٦)

"আল্লাহ কাউকে তার সামর্থের অধিক দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : ٧٨)

"আল্লাহ তোমাদের ওপর দ্বীনের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতার অবকাশ রাখেননি।" —(আল-হাজ্জ ঃ ৭৮)

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ط

"আল্লাহ তোমাদের প্রতি কি কি হারাম করেছেন তা তো তিনি স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। তবে যা করার জন্যে তোমরা প্রাণের বিনিময়ে বাধ্য হও (তার কথা আলাদা)।"—(আল-আনআম ঃ ১১৯)

www.bjilibrary.com

প্রাণের দায়ে বাধ্য হয়ে কিংবা অপরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যদি কেউ কোন অপরাধ করে তবে তা ক্ষমার যোগ্য। এটা ইসলামী ফিকাহ্‌র কথা কিন্তু ফিকাহ্‌বিদগণ এটা নিজেরা রচনা করেননি। ইসলামী শরীয়াতই এমত ঘোষণা করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ (النحل : ١٠٦)

"যার দিল নিসন্দেহে ঈমানের উপর স্থিতিশীল, সে যদি কারুর দ্বারা অন্যায় করতে বাধ্য হয়, তাহলে সে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।"

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ط (البقرة : ١٧٣)

"যে লোক বিদ্রোহী নয়, সীমালংঘনকারী নয়, তবুও সে যদি অন্যায় করতে বাধ্য হয়, তাহলে তার কোন অপরাধ হবে না।"

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

رفع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه

"আমার উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তি, ভুল বশত কোন অন্যায় কাজ করা কিংবা কারুর দ্বারা বাধ্য হয়ে কোন অপরাধ করা হলে তা পূর্বেই মাফ করে দেয়া হয়েছে।"

অল্প বয়স্ক, পাগল ও বিনিদ্রিত ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার মতও ফিকাহ্‌র পেশ করা মত। কিন্তু ফিকাহ্‌বিদরা তাও নিজেদের থেকে রচনা করেননি। বরং তা রাসূলে করীমের (সা) একটি বাণীর ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبى حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يصحوا ، وعن المجنون حتى يفيق -

"বালক—পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, নিদ্রিত—জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল—ভাল না হওয়া পর্যন্ত অপরাধী বলে অভিযুক্ত হবে না।"

একজনের অপরাধে অন্যজনকে শাস্তি দেয়া হবে না, এটা ইসলামী ফিকাহ্‌র একটা মৌলনীতি। কিন্তু তা ফিকাহ্‌বিদদের নিজস্ব কল্পনা প্রসূত নয়, তা কুরআন থেকেই গৃহীত। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

www.bjilibrary.com

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ج (الانعام : ١٦٤)

"কোন বহনকারীই অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না।"–(আল-আনয়াম)

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

ولا يواخذ الرجل بجريمة ابيه ولا بجريمة اخيه

"কোন ব্যক্তিই তার পিতার অপরাধে কিংবা তার সহোদর ভাইয়ের অপরাধে অভিযুক্ত হবে না।"

আবু রমলাও তার পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ সে তার অপরাধ তোমার উপর চাপাবে না এবং তুমিও তোমার অপরাধ তার উপর চাপাতে পারবে না।

ইচ্ছামূলক নরহত্যা এবং ভুল বশত নরহত্যার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে ইসলামী আইনে। কিন্তু এ পার্থক্যও ফিকাহ্‌বিদরা করেননি, ইসলামের মৌল বিধান কুরআন মজীদই এ পার্থক্যের কথা ঘোষণা করেছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَئًا ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖٓ -

"কোন মু'মিন ব্যক্তিই অপর মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে না–ভুলবশত হত্যা করা অন্য কথা। আর যে লোক কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করবে, তার দণ্ডস্বরূপ কোন ঈমানদার দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারের নিকট 'দিয়াত' সোপর্দ করে দিতে হবে।"

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط

"হে ঈমানদার লোকেরা। নরহত্যার ব্যাপারে 'কিছাছ' (হত্যাকারীকে হত্যা করার) ব্যবস্থা তোমাদের জন্যে লিখে দেয়া হয়েছে।"

—(আল–বাকারা ঃ ১৭৮)

www.bjilibrary.com

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ق وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ

قُلُوْبُكُمْ ط (الاحزاب : ٥)

"তোমরা যা কিছু ভুল কর, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তবে তোমাদের দিল ইচ্ছা করে যা করে (তাতে অবশ্যই অপরাধী সাব্যস্ত হবে)।" —(আল-আহযাব ঃ ৫)

অতি অল্প কয়েকটি বিষয়েরই আলোচনা এখানে করা হল। করা হল শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এমনিভাবে ইসলামী আইনের প্রত্যেকটি ব্যাপার সামনে রেখে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, তার কোনটাই ফিকাহ্‌বিদদের স্বকপোলকল্পিত নয়। তার সবই হয় কুরআন থেকে, না হয় সুন্নাহ থেকে গৃহীত। তবে ফিকাহ্‌বিদদের অবদান শুধু এতটুকু যে, তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং তা করতে গিয়ে তাঁরা কোথাও শরীয়াতের মূলনীতির বিরুদ্ধতা করেননি, লংঘন করেননি শরীয়াত আরোপিত সীমা।

শুধু তাই নয়, ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ কি, তা তাঁরা শরীয়াতের মূলনীতির ভিত্তিতেই মীমাংসা করে দিয়েছেন। এটা করার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। কেননা, শরীয়াত তো খুঁটিনাটি বিষয়ের বিধান নয়, তা হলো মূলনীতির সমষ্টি। আর এ মূলনীতির ভিত্তিতেই ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে শরীয়াতের ফায়সালা জানতে হবে। ফিকাহ্‌বিদরা তাই করেছেন মাত্র। ইসলামী ফিকাহ্ ফিকাহ্‌বিদদের কল্পনা প্রসূত বলে যারা দাবী করে, তার মূলে শুধু এতটুকু সত্যতাই রয়েছে, এর বেশী নয়। এ দাবীর উত্থাপকরা হয়ত আসল ব্যাপারটা বুঝতেই ভুল করে বসেছেন। হয়ত তারা ইসলামী ফিকাহ্‌কে আধুনিক আইনের মতই মনে করেছেন। আর আধুনিক আইন যে, আইন বিশারদদের কল্পিত, তা তো সর্বজনবিদিত। কাজেই ফিকাহ্ ও আধুনিক আইনের মধ্যে মৌল পার্থক্য রয়েছে। ফিকাহ্‌বিদরা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা ভিন্ন অন্য কিছুকে শরীয়াতের ভিত্তি বলে স্বীকার করেননি। প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাঁরা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র ফায়সালার সন্ধান করেছেন।

www.bjilibrary.com

ইসলামী সংস্কৃতির ধারক এক শ্রেণীর লোক

ইসলামী সংস্কৃতির ধারক সমাজের লোক এদেরই পাশাপাশি রয়েছে। তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, যদিও ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারকদের তুলনায় তাদের সংখ্যা অনেক কম।

মুসলিম সমাজের ওপর এ লোকদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। কেননা, তারা ইসলামের ধারক ও প্রবক্তা বলেই সাধারণভাবে পরিচিত। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতায় এদের কোন অংশ নেই বলেই তাঁরা শুধু ওয়াজ-নছীহত, ইমামতী বা মুদাররিসি ছাড়া অন্য কোন কাজে তাদের ডাকাও হয় না। তাঁরা অনেক সময় শরীয়াতের ফায়সালা প্রকাশ করেন, ফতোয়া দেন, কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রেই তাদের বিচার-ফায়সালা বা ফতোয়ার এক বিন্দু দাম দেয়া হয় না।

কিন্তু মুসলিম জাহানে ইউরোপীয় আইন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এরূপ অবস্থা ছিল না। তখন সমাজের ওপর এদেরই নিরংকুশ প্রাধান্য বর্তমান ছিল। ইউরোপীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এদের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর সমাজের ওপর তাদের প্রভাব ক্রমশ বিলীন হতে হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। অতপর তারা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েন। তাঁদের নানাভাবে অপদস্ত করতেও চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে অনেকেই নির্বাক হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা এক অক্ষম ও দুর্দশাগ্রস্ত জনমণ্ডলী বলে গণ্য হতে থাকেন।

অথচ এঁরা নিজেরা এবং মুসলিম জনগণ এঁদেরকেই ইসলামের জন্যে দায়ী মনে করে। কেননা, ইসলামী হুকুম আহকাম সম্পর্কে এরাই সবচাইতে বেশী জানেন, ইসলামকে তাঁরা আমাদের তুলনায় বেশী রক্ষা করতে সক্ষম। যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে অনেকবারই এঁরা ইসলামকে বাঁচাতে সক্ষম হয়নি। সক্ষম হয়নি শুধু ইউরোপীয় ব্যবস্থা ও আইনের অনুপ্রবেশ লাভের কারণে। কেননা, সারাটি মুসলিম জাহানেই ইউরোপীয় আইন-বিধান ও নিয়ম-কানুন একেবারে ছেয়ে গিয়েছিল এবং শরীয়াতকে সম্পূর্ণরূপে অকেজো করে রেখেছিলো। অতপর এদের মধ্যে দলে দলে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটতে লাগল, যারা শরীয়াত সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ও মূর্খ ছিল। যদিও বা কিছু জানত, তা হলে

জানত শুধু ইবাদাত ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের হুকুম-আহকাম। অনেকে আবার মনে করত যে, ইসলামী বিধান ও পাশ্চাত্য আইনের মাঝে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই; কিংবা ইসলামী বিধান পাশ্চাত্য আইনের অনেক কিছুই অস্বীকার করেন। অপর দিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবাধীন লোকেরা বিশ্বাস করত যে, ইসলাম একটা ধর্মমাত্র, রাষ্ট্র ও রাজনীতির ব্যাপারে তার করণীয় কিছুই নেই। মানুষের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইসলাম কোন বিধান দিতে পারে বলে তারা আদৌ মনে করত না। আর শরীয়াতের ব্যাপারে আলেমরা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বস্তুত আলেমরা যে, অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামকে রক্ষা করতে পারেনি, সে জন্যে তাঁদের দোষ দেয়া যায় না। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের এ অক্ষমতা ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। তবে তাদের এতটুকু ত্রুটি অবশ্যই লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁরা ইসলামকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেননি, এ জন্যে প্রয়োজনীয় সময় তাঁরা দেননি। কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু ক্ষেত্র অনুকূল ছিল না বলে তাঁরা সে চেষ্টায় সফলতা লাভ করতে পারেননি। যদি তাঁরা অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতেন, তাহলে তাঁরা নিসন্দেহে সাফল্যও লাভ করতে পারতেন।

বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশেই এমন লোক রয়েছেন, যাঁরা ইসলামকে পুন প্রবর্তিত দেখতে চান। সত্যদ্বীনের ব্যাপারে তাঁরা কোন অত্যাচারীর অত্যাচার এবং কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে ভয় করেন না। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ত্রুটি হলো তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুকরণ করতে সদা ব্যস্ত। তাঁরা কেবল ইবাদাত ও ওয়াজ-নছীহত করেই ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা কামনা করেন মাত্র। কিন্তু তাঁরা যদি মূল শরীয়াতকে পুন প্রবর্তিত করতে চাইতেন ও সে জন্যে চেষ্টা চালাতেন, ইউরোপীয় আইনের কোন্ কোন্‌টি ইসলামী শরীয়াতের পরিপন্থী, তা দেখাতেন, তাহলে তাঁদের ও ইসলামের অনেক কল্যাণ সাধিত হতে পারত। তাঁরা যদি এ পর্যায় প্রাণপণে চেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতেন, তাহলে যেসব দেশ গণতান্ত্রিক সেখানে জনমত প্রভাবিত করে বাস্তবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতেন।

একালে যাঁরা ইসলামকে পুনপ্রবর্তিত দেখতে চাচ্ছেন, তাঁরা কেবল উম্মী লোকদের মধ্যেই সমস্ত কর্মতৎপরতা ও প্রচার-প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ করে

www.bjilibrary.com

রেখেছেন। ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত লোকদের মধ্যে তাদের এ চেষ্টার কোন লক্ষণ দেখা যাচেছ না। অথচ এরাই সমস্ত জন-জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করছে। তাদের হাতেই রয়েছে আইন ও শাসনের সমস্ত ক্ষমতা। এই শ্রেণীর লোকদেরই ইসলামের সহিত পরিচিত করার জন্যে প্রবল চেষ্টা চালানো কর্তব্য ছিল সর্বপ্রথম। এদেরকেই ইসলামী বিধান জানিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কেননা, এরা যদি প্রকৃত ইসলামকে জানতে পারত, তাহলে এরা ইস-লামের বড় প্রবক্তা হয়ে উঠতে পারত।

আমি চাই ইসলামের আলেমগণ ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক প্রভাবাধীন লোকদের সম্মুখে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইসলামকে পেশ করুন। চাই, ইউরোপীয় আইনের যে যে ধারা ইসলামের পরিপন্থী, সেখানে তার বিরুদ্ধতা করা হোক এবং তার পরিবর্তে ইসলামের কোন্ বিধানটি কার্যকর হতে পারে, তা স্পষ্টভাষায় তাদের জানিয়ে দেয়া হোক। কেননা, তারা আর যাই হোক, মুসলমানত। পার্থক্য শুধু এই যে, তারা ইসলামের সাথে পরিচিত নয়। কিন্তু তাদের যদি উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহলে তাদের স্বভাবগত যোগ্যতা দ্বারা ইসলামকে ভালোভাবে জেনে নিতে ও গ্রহণ করতে পারবে।

আমি চাই, ইউরোপীয় প্রভাবাধীন এ লোকদের ইসলামী শরীয়াত রীতিমত পড়ানো হোক। তার মূলনীতি ও মৌল আদর্শ সম্পর্কে তারা অবহিত হোক। ইসলামী শরীয়াত যে, ইউরোপীয় আইনের তুলনায় অনেক উন্নত ও সাধা-রণভাবে সমস্ত মানুষের জন্যে কল্যাণকর, তা তারা গভীরভাবে বুঝতে সক্ষম হোক।

আলেমগণ যদি প্রত্যেক মাযহাবের কিতাবগুলো একত্রিত করে তার সার অংশ নিয়ে মাত্র একখানি কিতাব রচনা করতেন আধুনিক ভাষা ও পরিভাষায় তাহলে বিভিন্ন মাযহাবী মতের মাঝে একটা সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হতো। আমি চাই, আলেমগণ দেশের শাসন ও প্রশাসনে কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকদের সামনে ইসলামী বিধান পেশ করুন, মানব-রচিত আইনের শরীয়াত বিরোধী ধারাসমূহ তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠুক, তাহলে তারা তা এড়িয়ে চলবে। কেননা, তারা মুসলমান, ইসলামী বিধান কার্যকর করতে তারা অবশ্যই প্রস্তুত হবে। তাদের ত্রুটি হলো তারা ইসলামকে জানে না।

www.bjilibrary.com

সেই সাথে নতুন কোন আইন যেন শরীয়াতের বিরুদ্ধে রচিত হতে না পারে, তাদের পরামর্শ ছাড়া কোন আইন তৈরী না হয় এমন পরিবেশ গড়ে তোলাও আলেমদের কর্তব্য।

আলেমদের এ কথা বোঝা উচিত যে, মুসলিম দেশসমূহের বড় একটি অসুবিধা হল এই যে, সেসব দেশের শাসন কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকেরা ইসলামকে জানে না। সর্বসাধারণ মুসলমানদের অবস্থাও ভিন্নতর নয়। এরূপ অবস্থার প্রতিবিধান এটাই হতে পারে যে, এদের সবাইকে ইসলামের আদর্শ পূর্ণভাবে শেখাতে হবে। এমন সব পন্থাই গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে তারা ভালভাবে ইসলামকে জানতে ও বুঝতে সক্ষম হয়।

বলাবাহুল্য, ইউরোপীয় সংস্কৃতিবান লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে আমি ইতিপূর্বে যে মত প্রকাশ করেছি, তাতে তাদের মূল্য ও মর্যাদা খাটো করা আমার কোন উদ্দেশ্য নয়। কথাটি তিক্ত হলেও পুরাপুরি সত্য, এটা একটা বাস্তব ব্যাপার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া আমি তাদের খাটো করব কি, আমি নিজেও তো তাদের একজন। ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে পড়া-শুনা করার পূর্বে আমার অবস্থা তাদের মতই ছিল। আমিও শরীয়াত সম্পর্কে কিছু জানতাম না। সে বিষয়ে আমিও ছিলাম মূর্খ। কিন্তু আমার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অসীম মেহেরবাণী, পড়াশুনা করে এমন পর্যায়ে আমি উন্নীত হতে পেরেছি যে, অন্তত মূর্খতা যে বিদূরিত হয়েছে, তা অবশ্য স্বীকার করতে হবে। আর এ কারণেই আমি চাই না যে, আমার ভাই-বন্ধুরা আমার পূর্ববর্তী অবস্থায় এখনো পড়ে থাকুক। আমি এ মূর্খতা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই।

অনুরূপভাবে আলেম সমাজ সম্পর্কে বিশেষ পন্থা ও উপায় অবলম্বনের জন্যে যা কিছু বলেছি, তার মূলেও তাদের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যা বলেছি, তা শুধু নছীহত মাত্র। আর এরূপ নছীহত করার জন্যে তো ইসলামই নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে এ জন্যে যে, ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত লোকদের সাথে মেলামেশা করার মাধ্যমে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই আমি ওসব কথা বলেছি। আমি নিসন্দেহে বুঝতে পেরেছি যে, সমস্ত মানুষকে সুস্পষ্টভাবে ও সৌর্যবীর্য সহকারে ইসলামের সহিত পরিচিত করানোতেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। আলেম ছাহেবান আমার

www.bjilibrary.com

কথা ইচ্ছা হলে গ্রহণও করতে পারেন, আর ইচ্ছা হলে অগ্রাহ্যও করতে পারেন। তবে আমি তো আল্লাহ্‌র নিকট এ দোয়াই করি যে, মুসলমান ও ইসলামের পক্ষে যা কিছু কল্যাণকর তা' করার যেন তিনি আমাদের সবাইকে তওফীক দান করেন।

আমাদের দুরবস্থার জন্যে দায়ী কে?

আমাদের-দুনিয়ার মুসলমানদের-বর্তমান দুরাবস্থার জন্যে দায়ী আমরা সব মুসলমানই। ইসলামের এ দুর্গতির জন্যেও আমরাই দায়ী, অন্যরা নয়। তবে কতকের দায়িত্ব কতকের তুলনায় বেশী বা কম, কারুর দায়িত্ব হালকা, আবার কারুর দায়িত্ব অনেক শক্ত ও কঠিন। কিন্তু আমাদের মূর্খতা, ফাসেকী ও কুফরির ব্যাপারে আমরা সবাই দায়ী। মুসলিম জাতির সর্বপ্রকার দুর্বলতা পারস্পরিক মতবিরোধ ও দলাদলি এবং লাঞ্ছনা ও অপমানের জন্যে আমরা আমাদের ছাড়া আর কাকে দায়ী করতে পারি! যে দারিদ্র ও অভাব-অনটন আজ আমাদের তিলে তিলে ধ্বংস করছে, যে শোষণ, নিপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতন অহরহ আমাদের নিঃশেষ করছে, তার জন্যে আমরা আমাদের ছাড়া আর কাউকে দায়ী করতে পারি না।

এ হলো সমস্ত মুসলিম জাতির সামষ্টিক দায়িত্ব, সমস্ত মুসলিম জাতি সামগ্রিক ভাবেই ইসলাম ও মুসলিম জাতির বর্তমান চরম দুর্দশার জন্যে দায়ী। আর তার মূলে রয়েছে ইসলামের ব্যাপারে মুসলিম জনগণের চরম অজ্ঞতা ও মূর্খতা। মুসলিম জনগণ একটু একটু করে ধীরে ধীরে এ পতনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। ফলে এক সময় তারা অজ্ঞাতসারেই ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

মুসলমান জনগণ ফিস্‌ক-ফুজুরী, কুফরী ও নাস্তিকতায় লিপ্ত হয়ে তাদের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এগুলো বুঝি ইসলাম বিরোধী নয় কিংবা ফিস্‌ক-ফুজুরী, কুফরী ও নাস্তিকতার মুকাবিলা করার মত কোন সামর্থই বুঝি ইসলামের নেই। আর এটাই হলো মুসলিম জাতির সব দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ।

www.bjilibrary.com

বস্তুত ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্যে মুসলমানদের প্রতি তীব্র তাকীদ রয়েছে। এ জন্যে পারস্পরিক শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। কুরআন মজীদ এ পর্যায়ে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে ঃ

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ -(التوبة : ١٢٢)

"মুসলিম জনগণের মধ্য হতে এক একটি বাহিনী কেন বের হয়ে যায় না এ উদ্দেশ্যে যে, তারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও সমঝ্-বুঝ অর্জন করবে এবং তারা যখন ফিরে আসবে, তখন তারা তাদের জনগণকে সে বিষয়ে অবহিত ও সতর্ক করবে।" —(আত-তাওবা ঃ ১২২)

মুসলিম জাতির ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, তারা দলে দলে ঘর থেকে বের হয়ে গেছে, ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছে এবং নিজেদের দেশে ফিরে এসে জনগণকে সুশিক্ষিত করে তুলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উত্তরকালে এসব অবস্থা দেখা দেয় যে, মুসলিম দেশগুলোর সরকারসমূহ এ লোকদের ওপরই আক্রমণ ও নির্যাতন নিষ্পেষণের মর্মান্তিক আচরণ অবলম্বন করেছে। তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্মুখীন করে সর্বদিক দিয়ে পর্যুদস্ত হওয়ার ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহদ্রোহী শক্তির অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়েছে। ইসলামের দুশমনদের সাথে তাদের করতে হয়েছে বন্ধুত্ব। এ সব সরকারের দুর্নীতির কারণেই জনগণের এ দুর্দশা হয়েছে, জনগণ ছিল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরুপায়। এরূপ অবস্থায়ই ইসলামের মূলোৎপাটন ও ইসলামের জন্যে কাজ করে এমন রাজনৈতিক দলগুলোর ধ্বংস সাধনে মুসলিম জনসাধারণ এ সব সরকারের সহিত শরীক হয়েছে।

মুসলিম জনগণ তাদের সমস্ত শক্তি, সম্মান ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে তারা শক্তিমান ব্যক্তিদের ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের গোলাম হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। শাসক শ্রেণীর দাসানুদাস হয়ে থাকার অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। এ শাসকরা জনগণের শক্তি হরণ করছে, তাদের দৈহিক বল নিশেষ করে দিচ্ছে। তাদের মান্-মর্যাদাহানি করছে। মানবিক আজাদী থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যে যারা তাদের

www.bjilibrary.com

দ্বীনকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছে কেবল তাদেরই তারা কিছুটা সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে, দিয়েছে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা। এরূপ অবস্থায় মুসলিম জনগণ যদি তাদের হারানো শক্তি, সম্মান ও মর্যাদা পুন প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়, তা হলে ইসলামের দিকে তাদের পুরাপুরি প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

কিন্তু মুসলিম জনগণ বর্তমানে এক মারাত্মক গাফিলতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। তারা তাদের দ্বীন সম্পর্কে অচেতন, অচেতন তাদের বৈষয়িক জীবন সম্পর্কে। তাদের নিজেদের সম্পর্কেও যেন তাদের কোন চেতনা নেই। যেদিন তাদের চোখ খুলবে, তাদের প্রকৃত অবস্থা তাদের সম্মুখে উদঘাটিত হবে, তখনি তারা মর্মে মর্মে বুঝতে পারবে যে, তারা দুনিয়াও হারিয়েছে, হারিয়েছে দ্বীন এবং পরকালও। কেননা, আল্লাহর ব্যাপারে তারা চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে, তারা আল্লাহর কিতাবকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছে।

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের দায়িত্ব ঃ

ইসলাম ও মুসলমানদের বর্তমান মর্মন্তুদ দুর্দশার জন্যে মুসলিম দেশসমূহের সরকারগুলো সর্বাধিক দায়ী। কেননা, তারাই ইসলামকে জনজীবন থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ জনগণের জন্যে যা হারাম করেছেন, এ সরকারগুলো তাই তাদের জন্যে গ্রহণ করেছে। আল্লাহর দেয়া আইন-বিধানকে বাদ দিয়েই তাদের ওপর শাসনকার্য চালিয়েছে। এ সব মুসলিম পরিচালিত সরকারসমূহই মুসলিম জনগণকে ইউরোপীয় গোমরাহীর গভীর পংকে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহর দেয়া হেদায়েত অনুযায়ী জীবন যাপন করার কোন সুযোগই তারা জনগণকে দেয়নি। মানুষের মনগড়া আইন মানতে তাদের বাধ্য করেছে, ইসলামী শরীয়াতকে তারা একবিন্দুও কার্যকর করেনি।

বস্তুত মুসলিম সরকারসমূহ দেশ শাসনে, প্রশাসনে, রাজনীতিতে ও প্রতিষ্ঠান গড়ন ও পরিচালনে ইসলামকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলেছে। ইসলামী আদর্শের কোন একটি মূলনীতিও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে না রয়েছে কোন আজাদী, না সাম্য, না নিরপেক্ষ সুবিচার। মুসলিম হিসেবে জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও চরম অসুবিধা দেখা দিয়েছে। তাদের মাঝে না থাকল কোন সহযোগিতা, না একজনের দুঃখে দুঃখীত হওয়া, না একজনের

www.bjilibrary.com

বিপদে সাহয্যের হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে আসা। যুলুম, নির্যাতন, নিস্পেষণ ও শোষণ তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ফলে গোটা সমাজ ও জাতি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ফিস্ক্-ফুজুরী, আল্লাহদ্রোহিতা ও না-ফরমানী, পাপ ও গুনাহের স্রোত তাদের জীবন নদীতে দুরন্তভাবে প্রবাহিত হতে থাকল।

এ সব মুসলিম নামধারী সরকারসমূহই মুসলমান জনগণকে ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। ফলে তারা আল্লাহকেই চিনতে ও জানতে পারেনি, পারেনি তারা তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে।

এ সব মুসলিম সরকারসমূহ ইসলামের শত্রুরাই দখল করে নিয়েছে। অথচ সরকারের কর্তৃত্ব ইসলামের দুশমনদের দখলে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, মুসলমানরা ইসলামের দুশমনদের আনুগত্য স্বীকার করতে কখনো পারে না।

রাষ্ট্র প্রধানদের দায়িত্ব

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রধান ও কর্তারা ইসলামের বর্তমান অবস্থার জন্যে কম দায়ী নয়। মানব রচিত আইন তাদের ক্ষমা করলেও ইসলাম তাদের ক্ষমা করবে না, ছোট-বড় সব কাজ সম্পর্কেই তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

কিন্তু হে রাষ্ট্র প্রধানবৃন্দ! তোমাদের হাতেইত রয়েছে সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব। শক্তি তোমাদের মুঠোর মধ্যে। ইসলামকে তার বর্তমান দুরবস্থা থেকে মুক্ত করে তার সঠিক মর্যাদায় পুন প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতাও তোমাদেরই হাতে নিবদ্ধ। অথচ তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধতা করার নীতি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছ। এখন তোমাদের জীবন এর মধ্যেই অতিবাহিত হচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধতার কাজে তোমরা তোমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছ। তোমরা তা জেনে-বুঝে করছ, কি না বুঝে না জেনে করছ, তা তোমরাই জান। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তোমাদের এ আচরণই ইসলামকে দুর্বল করেছে এবং ইসলামী আদর্শবাদীদেরকে লজ্জাকরভাবে কোণঠাসা করে রেখেছে। আর এ সব কিছুর জন্যে তোমরাই দায়ী। আবার তোমাদের শক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে

www.bjilibrary.com

ইসলাম পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আর তোমাদের সত্যিকার কল্যাণ ঠিক তখনি হবে।

কিন্তু হে রাষ্ট্রপ্রধানগণ! তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। অথচ তোমাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও তোমাদের শক্তি সুসংহত হওয়ার ওপরই তোমাদের প্রকৃত কল্যাণ নির্ভরশীল। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও অনৈক্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আসলে তোমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরম ঐক্য স্থাপিত হওয়াতেই তোমাদের নিজেদের ও ইসলামের সার্বিক কল্যাণ নিহিত। তোমরা পরস্পরের নিকট নতি স্বীকার করবে, সেটা তোমাদের সকলের সাম্রাজ্যবাদীদের কবলিত হওয়া অপেক্ষা অনেক মংগলজনক।

তোমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান বটে ; কিন্তু তারও পূর্বে তোমরা মুসলমান, এটাই বড় কথা। অতএব তোমরা ইসলামকে সবকিছুর ওপর স্থান দিবে। তোমরা তারই ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করবে, এবং গোটা রাষ্ট্রকে তারই ভিত্তিতে গড়ে তুলবে। এ ধরনের রাষ্ট্র কায়েমের পথে তোমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মান মর্যাদাকে প্রতিবন্ধক হতে দিও না। তোমরা তো অবিনশ্বর নও, মৃত্যু অনিবার্য। আর মৃত্যুর পর হয় জান্নাত রয়েছে, না হয় রয়েছে জাহান্নাম। পরকালীন কল্যাণ লাভে তোমাদের এ রাজত্ব ধন–মাল বা জনশক্তি কোন কাজেই আসবে না। সেখানে তো কেবল নেক আমলই তোমাদের কাজে আসবে। তোমাদের অতীত ইতিহাস তোমাদের স্মরণে রাখা উচিত, তাহলে তোমরা হয়ত কল্যাণ লাভে উদ্বুদ্ধ হবে। তোমাদের পূর্ববর্তীরাই তো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী আইন–কানুন জারী করার জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু তোমরা কেন আজ সে রাষ্ট্র কায়েম করতে অনীহা প্রকাশ করছ ও পশ্চাদপদ হয়ে থাকছ?

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে তোমাদের ইচ্ছা শক্তির–দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্পের। প্রয়োজন হচ্ছে আত্মসংযমের, নিজেদের উপর নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার। তোমরা যদি আত্মসংযম লাভ করতে পার, যদি পার নিজেদের মন ও মগজের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে, তা হলে তোমরা সব কিছুর ওপরই বিজয়ী হতে পারবে। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখ, যদি তোমরা পাশ্চাত্য

www.bjilibrary.com

শক্তিধরদের সামনে দুর্বলতা দেখাও, তা হলে সমগ্র মুসলিম জাতিই হবে দুর্বল ও চরমভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত। শক্তিশালীরাই তোমাদের ওপর জয়ী হয়ে পড়বে। সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ে তোমরা হবে ভীত, সন্ত্রস্ত। তখন সে শক্তিগুলোই তোমাদের তাদের ইচ্ছামত নাচাতে থাকবে। কেননা, তারা ঐক্যবদ্ধ, তারা বুঝতে পেরেছে যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকাই প্রকৃত শক্তিশালী হওয়ার মর্মকথা। আর শক্তিমানরাই জয়ী হতে পারে, দুর্বলরা তো নয়।

হে নেতৃবৃন্দ, হে রাষ্ট্রপ্রধান ব্যক্তিরা! তোমরা কেবল প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের লোভে পড়ে থেকো না। বড় বড় উপাধি লাভই তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। রাজ মুকুট হওয়া উচিত নয় তোমাদের নিকট একমাত্র লোভনীয় বস্তু। এ লোভ ও লালসাই মুসলিম জাতিকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে। তাদের মাঝে ইসলামী প্রাণ শক্তিকে দুঃখজনকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে। তাদের দুর্বল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দিয়েছে। তাদের রাষ্ট্রগুলো বর্তমানে এতই ক্ষুদ্র ও দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, তারা আত্মরক্ষা করতেও সক্ষম হচ্ছে না, পারছে না নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা হাছিল করতে। তাই দেখা যাচ্ছে, মুসলমানরা সংখ্যায় বিপুল, দুনিয়ার সর্বত্র তারা ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের দেশে রয়েছে অফুরন্ত কাঁচামাল, কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তারাই এখন দুনিয়ার জাতিসমূহের মাঝে দুর্বলতর, সর্বাধিক লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত।

তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, তোমরা যদি ব্যক্তি স্বার্থের পিছনেই ছুটতে থাক, পদ ও উপাধি লাভ এবং ব্যক্তিগত লালসা চরিতার্থ করাই হয় তোমাদের লক্ষ্য, তাহলে যে পথে চলছ, তাই চলতে থাক। কিন্তু যদি তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও, তোমাদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে যদি সুসংহত কর, তাহলে সমগ্র মুসলমান মিলে একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত হবে।

হে রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিমগণ! তোমাদের এ উচ্চপদ ও বড় বড় উপাধি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ তোমাদের ও পূর্ববর্তীদের নিকট ইসলাম ও মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার জন্যে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তোমাদের দেশে ইসলাম যে অপরিচিত হয়ে পড়ল, রাষ্ট্র শাসনে পরিত্যক্ত হল, এ বিষয়ে তোমাদের অবশ্যই কৈফিয়ত দিতে হবে আল্লাহর দরবারে। তোমরা যে মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ না করে খন্ড-বিখন্ড ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ, তাদের শক্তি ও মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন

www.bjilibrary.com

করেছ, এ জন্যে তোমাদের এক কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে এ ব্যাপারে তোমাদের মনে যেন এক বিন্দু সন্দেহও স্থান না পায়।

হে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগণ! তোমরা কর্তৃত্ব ও রাজত্ব লাভের লোভ করো না। কেননা, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة

"তোমরা অবশ্যই রাজত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের জন্যে লালায়িত হবে। কিন্তু কিয়ামতের দিন এ জিনিসই তোমাদের পক্ষে খুবই লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।"

মনে রেখো, রাজত্ব ও কর্তৃত্ব বা শাসন ক্ষমতা একটা মস্তবড় আমানত। এ আমানতকে তোমরা অবশ্যই তার যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে সোপর্দ করবে। কেননা, এ বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করবেন। স্মরণ কর, রাসূলে করীম (সা) হযরত আবু যার গিফারী (রা)-কে বলেছিলেন ঃ

يا اباذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزى
وندامة الامن اخذها بحقها وادى الذى عليه فيها -

"হে আবু যার, তুমি খুব দুর্বল ব্যক্তি, আর এ রাষ্ট্রীয় পদ অতি বড় দায়িত্ব ও আমানতের ব্যাপার। কিয়ামতের দিন লজ্জা ও লাঞ্ছনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে এ জিনিস। তবে যে লোক এর অধিকার যথাযথ আদায় করবে ও এ ব্যাপারে তার উপর যে দায়িত্ব আসে তা ঠিক ঠিকভাবে পালন করবে, সে হয়ত তা থেকে মুক্তি পাবে।"

আলেম সমাজের দায়িত্ব

আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্যে আলেম সমাজের ওপর বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামের এ দুরবস্থার জন্যে তাদের অপরাধও নেহাত কম নয়। ইসলাম-অনভিজ্ঞ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে এ আলেমরাই তো দায়ী। কেননা, তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা এ সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাপারে কোথাও বিক্ষোভ দেখিয়েছে, আবার কোথাও তারা চুপ রয়েছে। মুসলিম

www.bjilibrary.com

রাষ্ট্রের অনৈসলামিক কাজকর্মের ব্যাপারে তারা কখনো সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে, আবার কোথাও সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে রয়েছে, মৌন সম্মতি জানিয়েছে। বিশেষত এ জন্যে যে, বিরাট মুসলিম সমাজকে তারা ইসলামী আদর্শ ও আইন বিধানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও মূর্খ করে রেখেছে, ইসলামের যত ক্ষতি করা হয়েছে এরা সেখানে একবিন্দু প্রতিবাদ করেনি, জনগণকে সে দিক দিয়ে হুশিয়ার করে দেয়নি।

এ শ্রেণীর আলেম সমাজ কার্যত ইসলাম ও মুসলমানের মাঝখানে প্রতিবন্ধক ও অন্তরাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি সে বিষয়ে তাঁরা মুসলিম জনগণকে অবহিত করেনি। যেসব রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষক সাহায্যকারী, তাদের ব্যাপারে তারা অত্যন্ত নরম নীতি গ্রহণ করেছেন। এর ফলেই জনগণ সাম্রাজ্যবাদের ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদের ক্রিড়নক রাষ্ট্রগুলোর আনুগত্য করেছে। আর ইসলামের এ অবক্ষয় ঘটেছে আলেমদের চুপচাপ ও নিক্রিয় থাকার কারণেই। শুধু তাই নয়, ইসলামের এ অবক্ষয়ে জনগণ নির্বাক দর্শক হয়ে রয়েছে, তার সাথে সহযোগিতা করেছে। কেননা, সাধারণ মানুষের ধারণা হল, যেসব কাজ ইসলাম সমর্থন করে না, আলেম সমাজ সে কাজ কখনো করে না।

সত্য কথা, আলেম সমাজ চোখ বন্ধ করে রেখেছে, মুখে 'টু' শব্দ করেনি, আর তারা তাদের কানে তুলো দিয়ে নাক টেনে ঘুমিয়ে রয়েছে। শত শত বছর আলেমরা এমনি চরম গাফলতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। আর তাঁদের সাথে সাথে সমস্ত জনগণও গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়ে গেছে। তারা মনে করেছে, ইসলামের কোন অসুবিধা হচ্ছে না, কেননা, তা না হলে আলেমরা কিছুতেই এমনি গাফলতির মধ্যে ঘুমিয়ে থাকতে পারতেন না।

বস্তুত আলেম সমাজ ইসলামের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ গাফিল হয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছে। এ সুযোগে ইসলামের বিরুদ্ধতা যতভাবে হতে পারে, তা সবই হয়েছে। ইসলাম বিরোধী কোন একটি কাজও বন্ধ করতে তাঁরা এ সময় চেষ্টা চালাননি। অনুরূপভাবে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামকে পুন প্রতিষ্ঠিত করতেও চেষ্টা করেননি এক বিন্দু।

www.bjilibrary.com

এ সময় শাসকবৃন্দ নানাভাবে অকথ্য অত্যাচার ও যুলুম চালিয়েছে, বহু হারামকে তারা হালাল বানিয়ে নিয়েছে। বহু রক্ত প্রবাহিত করেছে, মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করেছে, বিশ্বের দিকে দিকে বহু বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহর নির্দিষ্ট করে দেয়া সীমালংঘন করেছে। কিন্তু আলেমগণ তার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াননি। হারামকে হালাল করার ব্যাপারে ইসলাম তাঁদের প্রতি কোন নির্দেশই দেয় না। এ ক্ষেত্রে যেন তাদের কিছুই করণীয় নেই। অথচ 'আমর বিলমারূফ ও নাহী আনিল মুনকার'—অন্যায়ের নিষেধ ও প্রতিরোধ এবং ন্যায়ের আদেশ ও প্রতিষ্ঠা করা তাদের এক স্থায়ী কর্তব্য। শাসকদের নছীহত করা ও ইসলামী বিধান পুন প্রবর্তন করার চেষ্টা করা তাদের একটা দ্বীনী কর্তব্য ও দায়িত্ব।

ইসলামী দেশ ও শহর-নগর চুরমার হয়ে গেছে। মানুষের রক্তে ভেসে গেছে মুসলিম জনপদ, কিন্তু আলেম সমাজের মধ্যে তার কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। তাঁরা জনগণকে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত জিহাদের কথাও শুনাননি। জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবানও জানাননি।

অথচ আলেম সমাজের কর্তব্য ছিল এ সব বিপর্যয়কারী লোকদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। কাফের উৎখাতের অভিযান শুরু করা, ইসলামের দুশমনদের মস্তক চূর্ণ করে দেয়া। আলেম সমাজ তা করেনি।

ইসলামী সমাজে ও রাষ্ট্রে মানুষের মনগড়া আইন কানুন জারি হয়েছে, তার ফলে ইসলামী আইন সম্পূর্ণ বাতিল ও অকেজো হয়ে গেছে। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, এ আইনের ফলে তা মুবাহ ও হালাল পরিগণিত হতে থাকে। আর যা ছিল হালাল তাকে করা হল হারাম। কিন্তু ইসলামের এ দুর্দশা দেখে আলেম সমাজ কেঁপে উঠেনি, এর পরিণাম যে তাদের নিজেদের জন্যেই মারাত্মক, তা দেখেও তাদের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয়নি। তাঁরা নিশ্চিন্তে পানাহার ও আনন্দ স্ফূর্তি চালিয়ে গেছেন এবং ইসলামী জীবন যাপন করছেন বলে তাঁরা মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। তাঁরা একত্রিত হননি, এ অবস্থার মুকাবিলা করার চিন্তা করেননি, চিন্তা করেননি তাঁদের নিজেদের ও ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

ফলে সমাজে ফিস্‌ক্-ফুজুরী ব্যাপক আকার ধারণ করে। চারিদিকে নাচ-গানের আসর জমে বসতে শুরু করে। মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত নিয়ে

www.bjilibrary.com

বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে জনগণ ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হয়ে উঠল।

ওদিকে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বীনী শিক্ষা ও দ্বীনী ভাবধারা শূন্য হয়ে পড়ে। দ্বীনী আলেমরাই সেদিকে প্রথম অগ্রসর হয় এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে তাতে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করেন। সেই সংগে সর্বত্র খৃষ্টান মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কায়েম হয়। এসব মিশনারীর প্রধান শিকার ছিল মুসলিম ছেলেমেয়েরা। বিদেশী ভাষা ও নাচ-গান, পাশ্চাত্য ধরন-ধারণ ও আচার-অনুষ্ঠান শেখার জন্যে আলেমরা তাদের মেয়েদেরকেও তাতে ভর্তি করেন। ফলে তারা চিন্তায়-বিশ্বাসে ও আচারে-চরিত্রে পুরাপুরি খৃষ্টান হয়ে যায়।

এসব রাষ্ট্র ও সরকার প্রয়োজন মত আলেমদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। যখনি বিপদ বা কোনরূপ গণঅসন্তোষ দেখেছে, অমনি রাষ্ট্র-সরকার আলেমদের নিকট সাহায্য ও সহযোগিতা চেয়েছে। আলেমরাও সাথে সাথে মুসলমানদের উপদেশ দিতে শুরু করেছেন সরকারের আনুগত্য করার জন্যে। কোন্ সরকারের?...যে সরকার মদ্যপান হালাল করেছে, যেনা, কুফরি ও ফাসেকীকে অবাধ ও ব্যাপক করে দিয়েছে। আর জনগণের ইচ্ছা ও শাসকদের খামখেয়ালীর ভিত্তিতে ইসলামের আইন-কানুনে রদ-বদল ঘটিয়েছে।

মুসলমানদের এরূপ অবস্থা দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। তারা দীর্ঘকাল ধরে ফিস্‌ক-কুফ্‌রী, না-ফরমানী ও আল্লাহদ্রোহিতাকেই সত্যিকার ইসলাম মনে করতে থাকল। ফলে তা-ই ব্যাপক ও প্রচণ্ড হয়ে উঠল। চারিদিকে চরম বিপর্যয় দেখা দিল, সংশোধনী প্রচেষ্টা চালানো কঠিন হয়ে পড়ল। আর এ সব কিছুই হল আলেমদের অনুগ্রহে এবং ইসলামী আইন জারি করণে তাদের চরম অনীহার দরুন।

অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, আলেমরাই হচ্ছেন নবী ও রাসূলগণের উত্তরাধিকারী—ওয়ারিস। আর তাঁরা যা কিছু করছেন তা নিশ্চয়ই নবী-রাসূলের উত্তরাধিকারীদের কাজ নয়। ইসলাম তো 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার' করার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে আলেমদের ওপর। কিন্তু

www.bjilibrary.com

প্রধান আলেমরাই যখন এ দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে চললেন, তখন এ বিরাট দায়িত্ব আর কে পালন করবে?

কিন্তু মিশরীয় আলেমদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তাদের পথ তিনি উন্মুক্ত করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা কথা বললেন, এবং তাদের সাধারণ রীতির বিরুদ্ধে সমবেত হয়ে সমস্ত ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করতে লাগলেন, বক্তৃতা-ভাষণ দিতে শুরু করলেন। কিন্তু সেসব দ্বীন ইসলাম কায়েম করার উদ্দেশ্যে ছিল কি?

আল্লাহর কছম, আসল ব্যাপার তা নয়। আসলে এ সময় তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন মান-সম্মান, সুনাম-সুখ্যাতি ও ধন-ঐশ্বর্য লাভ করার উদ্দেশ্যে। ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ করাই ছিল তাঁদের চরম লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যেই তাঁরা ভাষণ বিবৃতি প্রচার করেন, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করেন, উদাত্ত বক্তৃতা-ভাষণ দিয়ে মজলিস সরগরম করে তোলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তাঁরা কুরআন-হাদীসকে ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হননি।

এ সব কাজই তাঁরা করেছেন নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে, নিজেদের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্যে। ইসলামের খাতিরে ও ইসলামের তাগীদে তাঁরা কিছুই করেননি। মনে হচ্ছে, তাঁদের নিজেদের অপেক্ষা ইসলাম যেন এক অগুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং ইসলাম অপেক্ষা তাঁদের মান-মর্যাদাই যেন অনেক বেশী দামী জিনিস। আরো দুঃখের কথা, এ সব সভা-সম্মেলনে কেউ কেউ ইসলামের কথা লোকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু এরা তাদের কথা বলতে দেয়নি বরং তাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। মনে হয়, আলেমদের দৃষ্টিতে ইসলামের জন্যে কথা বলা ও কাজ করা যেন একটা বড় অপরাধ। হে আলেম সমাজ! তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে এবং ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চল।

তোমরা কেন বুঝ না, ইসলামের ইজ্জত ও সম্মান হলেই না তোমাদেরও সম্মান ও ইজ্জত হতে পারে, ইসলামের শক্তিতেই তোমাদের শক্তি নিহিত। কাজেই তোমরা যদি সম্মান ও শক্তি লাভ করতে চাও, তাহলে ইসলামের সম্মান ও শক্তি বৃদ্ধির জন্যে কাজ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য।

www.bjilibrary.com

হে আলেমগণ! ইসলামের আইন বিধান বর্ণনা না করে তোমাদের মুখ বন্ধ করে রাখবে, আল্লাহর শত্রুদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিবে, এমন কোন নির্দেশতো ইসলামে দেয়া হয়নি।

মুসলমানদের পরিচালিত সরকারসমূহ যখন ছাত্রদের ইসলামী আইন বিধান শেখাবার ব্যবস্থা করছে না, তখন তোমরা যদি বিভিন্ন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ছাত্রদেরকে তাই শিক্ষা দাও, তাহলে তাতে ইসলামের দৃষ্টিতে কোন অপরাধ হওয়ার তো কথা নয়। ইসলামে এ কাজের বাধাতো নেই কিছু। ইসলামের হে আলেমগণ! মিম্বরে দাঁড়িয়ে তোমরা লোকদের ইসলামের শিক্ষা দিবে, উন্নতমানের নৈতিকতা, ইসলামের সৌন্দর্য ও ইবাদাত-বন্দেগীর নিয়ম-কানুন শেখাবে—ইসলামে এর উপর কোন নিষেধ আরোপ করা হয়নি। কিন্তু তোমরা তা না করে ইসলাম ও শরীয়াতের দিক দিয়ে তাদেরকে মূর্খ বানিয়ে রেখেছ। তারা জানে না ইসলামী শরীয়াত, ইসলামী বিচার, ইসলামের অর্থনীতি ও রাজনীতি।

তোমরা কেন জনগণের নিকট ইসলামের আদর্শ পুরাপুরিভাবে পেশ করবে না, অথচ এটাই তোমাদের বড় দায়িত্ব। তোমরা এ কাজ না করলে এ কাজ করার লোক কে আছে? যেসব শাসক মুসলিম জনগণকে ইসলাম বিরোধী কাজ করতে বাধ্য করে, তাদের ব্যাপারে ইসলাম কি নির্দেশ দিয়েছে, তা তোমরা জনগণকে বুঝিয়ে বলবে না কেন? এরূপ অবস্থায়ও কি তাদের মেনে চলা ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের কর্তব্য? জনগণ কেন শাসকদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করতে বাধ্য হবে? না এরূপ অবস্থায় শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জনগণের ধর্মীয় কর্তব্য?

মানব রচিত আইন পালন করার ব্যাপারে ইসলামের কি নির্দেশ, তা কি চুপ-চাপ মেনে চলতে হবে?—এ বিষয়ে ইসলামের কি হুকুম?—তা কি জনগণকে তোমরা জানিয়ে দিয়েছ কখনো? ধন-সম্পদ, অত্যধিক মূল্য গ্রহণ ও খাদ্য দ্রব্য মওজুদ করণ সম্পর্কে ইসলামের ফায়সালা কি? আদর্শ ও কর্মনীতি কি, তা কি তোমরা জনগণকে বুঝিয়েছ? আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর্গঠনের ব্যাপারে ইসলামের নীতি কি, তা কি তোমরা বলেছ?

ইসলামের দাওয়াতদাতা ও আন্দোলনকারীদের যারা বিরুদ্ধতা করে, তাদের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ কি, তাও তো কখনো জনগণকে বুঝিয়ে

www.bjilibrary.com

বলা হয়নি। কিন্তু কেন? এরূপ অবস্থায়ও কি জনগণকে চুপ করে থাকতে হবে, নীরবে সইতে হবে সব অত্যাচার যুলুম?

জনগণকে নছীহত করা, জনগণের নিকট ইসলামী আদর্শের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তা কি জীবনে একবার করলেই দায়িত্ব পালিত হবে, না সবসময় ও সর্বাবস্থায়ই তা করা কর্তব্য?

যে মুসলমান নিজের ব্যক্তিগত সম্মান লাভের জন্যে সচেষ্ট কিন্তু ইসলামের মর্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধির ব্যাপারে মোটেই সচেষ্ট নয়, তাদের প্রতি কিরূপ আচরণ গ্রহণ করতে হবে বলে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে?

হে আলেম সমাজ। তোমাদের মাঝে ক্ষুদ্র একটি দল যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করছে এবং তারা তাদের নীতির উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। অস্বীকার করছি না, অনেক আলেমই নিজেদের ইলম, শক্তি–সামর্থ ও জীবন নিয়োজিত করেছেন কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। এ পথে কাজ করতে গিয়ে তারা কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকেই ভয় করেননি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁদের সংখ্যা এতই অল্প যে, তা যেমন গৌরব করার মত নয়, তেমনি তাদের নেক অবদানের আবরণে তোমাদের অপকর্ম কিছুমাত্র ঢাকতে পারে না।

তাই আলেম সমাজের কর্তব্য, এ অল্প সংখ্যক লোককে নিজেদের আদর্শ ও অনুসরণীয় রূপে গ্রহণ করে অনুরূপ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। ইসলামের প্রতি তোমাদের সঠিক দায়িত্ব দীর্ঘদিন ধরে পালন করছ না। কিন্তু এখন চুপচাপ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার আর সময় নেই। এখনো তোমরা জাগ্রত হও, সক্রিয় হও, তোমাদের জন্যে এবং ইসলামের জন্যে এতেই বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

আমার এ কথাগুলো তোমাদের মর্মস্পর্শ করবে কি?

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

www.bjilibrary.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।